রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে অলংকার ব্যবহার

নাসিমা চৌধুরী

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৪

RB
891.4409
CHR
C-2
D

Dhaka University Institutional Repository

382699

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে অলংকার ব্যবহার

নাসিমা চৌধুরী

Dhaka University Library
382699
382699

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত গবেষণাপত্র

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংগ কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ, পাশ করার পর বাংলা সাহিত্যের কোন একটি অনালোচিত দিক দিয়ে উচ্চতর গবেষণা করার জন্য আমার আগ্রহ জন্মে। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সাঈদ-উর রহমানের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে তিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ নিয়ে কাজ করতে বলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে চাইলে তিনি রাজী হন। তদনুযায়ী তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. কোর্সের দ্বিতীয় বছরে এই গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করা হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ কম আলোচিত বিষয়কে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এখানে।

নানা কারণে মধ্যযুগের সাহিত্যের চর্চা প্রায় উঠে যাচ্ছে আমাদের দেশে। অথচ এবিষয়ে কাজ করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও ডঃ আহমদ শরীফের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে বাংলাদেশে গবেষণার কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। পুঁথি আবিষ্কার, সম্পাদনা ও ইতিহাস রচনার কাজ তাঁরা সুসম্পন্ন করেছেন, তার ভিত্তিতে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

382699

মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকলেও আমার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তদুপরি নির্ধারিত এক বছরের মধ্যে আমাকে কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। অলংকার সম্বন্ধে আমার ধারনা প্রাথমিক পর্যায়ে। তবু, কাজ করতে পেরেছি অলংকার-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস-এর উদার সহযোগিতায়। আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ সাঈদ-উর রহমান এর পরামর্শ ও উপদেশ পেয়েছি সর্বক্ষণ। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। এছাড়া জনাব মুস্তাফিজুর রহমান আমার গবেষণার কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করে আমাকে ঋণী করেছেন। আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করার জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী এবং রাজবাড়ী পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এই সব গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নাসিমা চৌধুরী

তারিখঃ-

ঢাকা, ২০শে জুন, ১৯৯৪

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় :

382699

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনকথা, ও
তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও কাব্য পরিচিতি .... ১ - ১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

মধ্যযুগের কাব্যে অলংকার ব্যবহারের ঐতিহ্য ১৫-৪১

তৃতীয় অধ্যায় :

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বিভিন্ন কাব্যে অলংকারের ব্যবহার ৪২-৭৬

চতুর্থ অধ্যায় :

উপসংহার ৭৭-৮৪

গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

মধ্যযুগের সাহিত্য বলতে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক ধরনের রচনাকে বোঝানো হয়। বিষয় প্রধানত ধর্ম কেন্দ্রিক হয়, রোমান্সপ্রধান হলেও তাতে অপরোক্ষে ধর্মভাবনা ক্রিয়াশীল থাকে। কবিরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে গোষ্ঠীভাবনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেন। সব রচনাই কাব্যাকারে লিখিত হয়, ছন্দেও বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

এই বৈশিষ্ট্যসমূহ ধারন করে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক বিশাল সাহিত্য রচিত হয়েছিল। সময়ের দিক থেকে মধ্যযুগ যেমন দীর্ঘ, রচনা সংখ্যায়ও বিপুল। সেকালে ধর্ম প্রচারের জন্য ও ধর্ম সংঘাতের পট ভূমিতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কবিরা যার যার উপাস্যকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বৌদ্ধ, হিন্দু, নাথ ও মুসলমান, সবাই ধর্ম সাহিত্য রচনার জন্য বাংলা ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

মধ্যযুগ শুরুর সীমা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে সবাই একমত যে, আঠার শতকে মধ্যযুগ শেষ হয়ে উনিশ শতকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগের সমাপ্তি-শতকে বেশ কজন প্রতিভাবান কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়গুনাকার, ফকির গরীবুল্লাহ, রামেশ্বর ভট্টাচার্য ও রাম প্রসাদ সেন এই শতকের শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা। এঁরা সবাই একেকটি ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। শিবায়ন ধারার সেরা কবি বলে বিবেচিত হন রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

মধ্যযুগের সাহিত্যসমালোচনায় সমালোচকদের উৎসাহ বিস্ময়কর ভাবে কম। কবির কাল নির্ণয়, কাব্যে বিধৃত সমাজচৈতন্যের আবিষ্কার ও ধর্মচিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন মূলত সেসব দিকেই পন্ডিতদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে। অবশ্য এর কারনও আছে। কবির কাল যথাযথভাবে নির্ণয় করতে না-পারলে কবিকে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার সমাধান সব কবির ক্ষেত্রে সন্তোষজনকভাবে হয়েছে বলা যাবে না। তবে অধিকাংশ কবির কালই মোটামুটি জানা গেছে এবং তাঁদের কাব্যেও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে বিভিন্ন কাব্যের আলোচনা করার অসুবিধা কম।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ধর্মান্দোলনের পেক্ষাপটে কাব্যরচনা করলেও মধ্যযুগের কবিরা আশ্চর্যজনকভাবে আঙ্গিক সচেতন ছিলেন। প্রধান কবিরা সবাই পন্ডিত ছিলেন। ধর্ম , শাস্ত্র , পুরাণ সম্বন্ধে তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর জানতেন , বিভিন্ন ভাষা , সংগীত শাস্ত্র ও কাব্যশাস্ত্রেও তাঁদের বিলক্ষণ দখল ছিল। তাঁদের অধিকাংশই প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র নির্দেশিত পথে কবিতা রচনা করেছেন। পদাবলীর কবি চন্ডীদাস একেত্রে সম্মানজনক ব্যতিক্রম হবেন। তাছাড়া বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ,কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিপ্রদাস পিপিলাই , ঘনরাম চক্রবর্তী , ভারতচন্দ্র রায়, আলাওল, দৌলত কাজী, বাহরাম খান , কৃত্তিবাস, প্রায় সবাই বিষয়ে ও অলংকার শাস্ত্রে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁরা আঙ্গিক সচেতন ছিলেন , নানা অলংকারে কাব্যদেহকে প্রসাধিত করতে যত্ন নিয়েছেন। ব্যক্তি-প্রতিভার তারতম্যে ও যুগের প্রভাবে হেরফের হলেও প্রকরণকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে তাঁরা কবিতা রচনা করেছিলেন।

কবি আলাওল বলেছেন -

" কাব্যসিন্ধু শব্দ মুক্তা কবি সে ডুবার।
বহু যত্নে ডুবি তুলে রতন সুচার ॥"

কবিতার প্রথম উপাদান কবির বক্তব্য। বক্তব্যবিহীন কবিতা হয়না, তবে বক্তব্যই কবিতা নয়। কবি যখন নিজের বক্তব্যকে শব্দ ও অর্থের আশ্রয়ে পাঠক ও শ্রোতার কাছে আকর্ষনীয় করে তুলতে পারেন , তখনই কবিতার জন্ম হয়। শব্দ ও অর্থ দুটোকেই আকর্ষনীয় করে তোলার জন্য কবিরা অলংকারের ব্যবহার করেন। আধুনিক কালের কবিরা শব্দের আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে নতুনতর তাৎপর্য বা ব্যাঞ্জনা আবিস্কার করতে আগ্রহী, আর মধ্যযুগের কবিরা শব্দকে 'ঝলমল' করে তোলায় ছিলেন উৎসাহী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন -

" সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল।"

ঝলমল করে তোলার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছেন রামেশ্বরের সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত ভাষায় 'অলম' শব্দের এক অর্থ 'ভূষন' তাই বুৎপত্তিগত অর্থ ধরলে যার দ্বারা ভূষিত করা হয় তাই অলংকার । হার চুড়ি কেয়ুর কুন্ডল ইত্যাদি সব কিছুই অলংকার, কারন মানুষ এ গুলির দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করে থাকে ।

বাক্যের শব্দ ও অর্থকে নিরাভরন না রেখে অলঙ্কারের সাজ-সজ্জার দ্বারা সুচারু ও পোশাকী করে তুলতে পারলে কাব্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্ট হয় । অনেকে কাব্য বলেত শব্দ ও অর্থের অলঙ্কৃত প্রকাশকেই বুঝে থাকেন । অলঙ্কৃত বাক্য যেমন কাব্য হয়, তেমনি নিরলঙ্কার বাক্যও কাব্য হতে পারে । অলংকার শব্দটির আরেক অর্থ হচ্ছে - যে সাজ সজ্জা দিয়ে শরীরকে সুন্দর করা হয়, শোভিত করা হয় অথবা অর্থ সামর্থ্য বৃদ্ধি করে । তাই কাব্যে আমরা অলংকার শব্দ দ্বারা দুটি অর্থেরই সমর্থন পাচ্ছি -

ক। অলংকার কাব্য দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ;

খ। অলংকার কাব্য দেহের অর্থ সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলে ।

কাব্যের এই অলংকারের সাথে দেহের সৌন্দর্য বিধায়ক অলংকারের তুলনা করার প্রবনতা প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায় । উভয় ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য বিধায়ক ক্ষমতার উপস্থিতি রয়েছে । কিন্তু উভয়ের মৌলিক পার্থক্যও লক্ষনীয় বিষয় । দেহের অলংকার দেহ থেকে খসিয়ে নেয়া চলে, কিংবা অতিরিক্ত অলংকার আরোপ করাও চলে । তাতে দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়, বড় কোন ক্ষতি হয় না । কিন্তু কাব্য দেহ একবার গঠিত হয়ে গেলে তা থেকে অলংকারকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না , তেমনি নতুন অলংকার আরোপও করা যায় না । যদি করা হয় তবে কাব্যদেহ পরিবর্তিত হয়ে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে । এ অলংকার সহজাত , কাব্যদেহ রচনার সাথে সাথে তার সৃষ্টি হয় ।

শব্দ ও অর্থের ভিত্তিতে অলংকারকে দুটি প্রধানভাগে ভাগ করা থাকে :

১. শব্দালংকার ২. অর্থালংকার ।

শব্দ এবং অর্থকে অবলম্বন করেই কাব্য গড়ে উঠে । তাই অলংকার উভয়ের উপরেই নির্ভরশীল । এগুলো বিচার করেই শব্দালংকার এবং অর্থালংকার রূপে অলংকারের দ্বিধাবিভাগরীতি গ্রহন করা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দালংকারের আবেদন শ্রুতির কাছে , অর্থালংকারের আবেদন বুদ্ধির কাছে, মননের কাছে। শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝতে না পারলে অলংকারত্ব পরিস্ফুট হয় না।

শব্দালংকারের সংখ্যা খুব বেশী নয়; প্রধান কটি হলো অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি, ও পুনরুক্তবদাভাস।
অর্থালংকারের শ্রেণী বিভাগ এবং সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য থাকলেও নিম্নোক্ত শ্রেণী বিভাগটি গ্রহনযোগ্য বলে মনে হয়।

১. সাদৃশ্যমূলক অলংকার :- উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, উল্লেখ, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি এবং প্রতীপ।

২। বিরোধমূলক অলংকার : বিরোধ, বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, ও অসঙ্গতি।

৩। গূঢ়ার্থমূলক অলংকার : অপ্রস্তুত প্রশংসা, অর্থান্তরন্যাস, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি।

৪। শৃঙ্খলামূলক অলংকার : দীপক, তুল্যযোগিতা, সার, একাবলী, কারনমালা ইত্যাদি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যে অলংকারের প্রয়োগ পরীক্ষা করা এবং অলংকার ব্যবহারের সাথে কবি মানসের ও সমাজ মানসের যে সম্পর্ক থাকে, এই সম্পর্কটা অনুসন্ধান করাই এ গবেষনার লক্ষ্য। বিষয়বস্তুর কারনে যেমন তিনি প্রসিদ্ধ, তেমনি প্রসিদ্ধ বিবিধ অলংকার ব্যবহারের কুশলতায়। তাঁর কাব্যেই শিবকে কেন্দ্র করে বাংলার কৃষি জীবনের বিশুদ্ধ আলেখ্য তৈরী হয়েছে, আবার হিন্দু মুসলিম ধর্ম সমন্বয়ের সুষ্ঠু আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। অলংকার ব্যবহারেও তিনি অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন, তাঁর কবিতার চরনে - চরনে অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মতো।

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয় নিয়ে এ পর্যন্ত কোন আলোচনা হয়নি । মধ্যযুগের সাহিত্যেও ঐ দৃষ্টিতে আলোচনা-করার উদাহরণও দেখা যায় না । সেই অভাববোধ থেকেই এই বিষয় নিয়ে গবেষনা করার উৎসাহ বোধ করেছি ।

গবেষনাপত্র চার অধ্যায়ে রচনা করা হয়েছে । প্রথম অধ্যায়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনী ও কাব্যের পরিচিতি দেয়া হয়েছে । কবির জন্ম, বংশ, নিবাস, সময়কাল এবং তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও কবির কাব্যগুলি আলোচনা করে তার কাহিনী, ভাষা এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মধ্যযুগের কাব্যে অলংকার ব্যবহারের ঐতিহ্য । মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে কয়েকজনের কাব্য অবলম্বনে অলংকার প্রয়োগের ধারনা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে । এঁরা হলেন বৈষ্ণব পদাবলীর বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস, রোমান্স কাব্য ধারার মুহম্মদ কবীর, দৌলত উজীর বাহরাম খান, আলীওল এবং দৌলত কাজী, মংগল কাব্য ধারার ঘনরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায়, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ।

তৃতীয় অধ্যায়টিই মূল অংশ । এতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত দুটি কাব্য (সত্যপীরের কথা , এবং শিব-সঙ্কীর্তন) অবলম্বন করে বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগ বিস্তারিত উদাহরন সহযোগে বিশ্লেষন করা হয়েছে । বিভিন্ন অলংকারের ব্যাখ্যামূলক সংজ্ঞাও এ-অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

শেষ অধ্যায়টি উপসংহার । এখানে প্রথম তিন অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যের সারসংক্ষেপ আছে : এবং কবির অলংকার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের কারন অনুসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

।। প্রথম অধ্যায় ।।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনকথা, তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও কাব্য পরিচিতি

এক.

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবন কথা :

রামেশ্বর ভট্টাচার্য মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট কবি । 'শিবায়ন' ধারার কবিদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয় । সাধারন পাঠক ও কাব্যানুরাগীদের কাছে তিনি বিশেষ পরিচিত নন । তিনি পরিচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছাএ-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকদের কাছে । তিনি তাঁর দুটি কাব্যে নিজের সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ করেছেন । 'সত্যপীরের কথা' কাব্যে উল্লেখ আছে - "সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম ।"[১]

এই যদুপুর গ্রাম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগণায় অবস্থিত । এখানে বাস করার কালে তিনি 'সত্যপীরের পুথি' রচনা করেছিলেন । দ্বিতীয় কাব্য 'শিব সঙ্কীর্ত্তণ' এ তিনি পরিচয় আরেকটু বিস্তারিতভাবে দিয়েছেন :-

ভট্ট নারায়ণ মুনি সন্তান কেশর কণী
যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ ।
তস্য সুত কৃত কীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী
তস্য সুত বিদিত লক্ষণ ।।
তস্য সুত রামেশ্বর শম্ভুরাম সহোদর
সতী রূপবতীর নন্দন ।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী
অযোধ্যা নগর নিকেতন ।।
পূর্ব্বে বাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত ।
স্থাপিয়া কৌশিক তটে বরিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত ।।[২]

---

১. রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সত্যপীরের কথা, শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৩৩৬), পৃষ্ঠা ৫ ।

২. রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শিব সঙ্কীর্ত্তণ, শ্রীযোগীলাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৫৭), পৃষ্ঠা ১৮৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি ভট্টনারায়ণ বংশজ কেশর কণীর কুলে জন্মগ্রহণ করেন । বঙ্গের শূরবংশীয় রাজা আদিশূর হিন্দু ধর্মের এবং হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে কাণ্যকুব্জ থেকে পাঁচজন সৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেছিলেন, ভট্টনারায়ণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম ।

রামেশ্বরের প্রপিতামহের নাম নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, পুত্র গোবর্ধন চক্রবর্তী । গোবর্ধন চক্রবর্তীর পুত্র লক্ষণ চক্রবর্তী পাণ্ডিত্য ও যজনযাজন ক্রিয়ার জন্য ভট্টাচার্য পদবী গ্রহন করেন । তিনিই রামেশ্বর ভট্টাচার্যের পিতা । কবির মাতার নাম রূপবতী, সহোদরের নাম শম্ভুরাম এবং তিন বোনের নাম পার্বতী, গৌরী ও সুরসুতী । তিনি দুই বিয়ে করেছিলেন । স্ত্রীদের নাম সুমিত্রা এবং পরমেশ্বরী । সম্ভবত কবি নিঃসন্তান ছিলেন, কারণ গ্রন্থের কোথাও তাঁর সন্তান-সন্ততির নামের উল্লেখ নেই ।৩

রামেশ্বর ভট্টাচার্য ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি । তাঁর প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে মনে হয় । কিন্তু হেমৎ সিংহ নামক জনৈক অত্যাচারী জমিদারের সঙ্গে বিরোধের কারণে তাঁকে নিজের নিবাস ছাড়তে হয়েছিল । এ ঘটনার উল্লেখ কবির কাব্যের মধ্যেই রয়েছে :-

পূর্ব্ব বাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত ।
স্থাপিয়া কৌশিক তটে করিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত ।৪

নিজের বসতবাড়ী ও বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে কবি খুব বিপদে পড়েছিলেন । এ অবস্থায় কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি মেদিনীপুরাধিপতি রামসিংহের আশ্রয় লাভ করেন ।

---

৩. শিব সঙ্কীর্ত্তণ, ভূমিকা ।

৪. ঐ ভূমিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা রামসিংহের রাজধানী ছিল কর্ণগড় । তিনি ছিলেন রাজা রঘুবীর সিংহের বংশধর । কবি রামেশ্বর রঘুবীরের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রঘুবীর সূর্য্য বংশীয় নরপতি রঘুর তুল্য প্রতাপশালী, ধার্মিক এবং যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন । রাজা রামসিংহ ভাগ্যবিড়ম্বিত কবি রামেশ্বরকে নিজের সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন ।৫ রাজা রামসিংহ সম্পর্কে তাঁর কাব্যে বর্ণনা রয়েছে -

রামচন্দ্র মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্ম্মিক রসিক রণধীর ।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রামসিংহ মহাবীর ।।
তস্য সুত যশোমনু সিংহ সর্ব্বগুণ যুত
শ্রীযুত অজিত সিংহ তাত ।
মেদিনীপুরার পতি কর্ণগড় অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাত ।।
রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ, রূপে রাম
প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি ।
শত্রুর সমান সভা জলনু আনল আভা
সুবেষ্ঠিত পণ্ডিত সহ কবি ।।
দেবপুত্র নৃপবরে শ্রবনে পাতক হরে
দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন ।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রমে করয়া ঘর
বিরচিল শিব সঙ্কীর্ত্তণ ।। ৬

রাজা রামসিংহের পুত্রের নামই যশোমনু সিংহ । ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাম সিংহ স্বর্গারোহন করলে, যশোমনু সিংহ রাজ্যাধিকার করেন ।

---

৫. শিব সঙ্কীর্ত্তণ, ভূমিকা ।

৬. ঐ পৃষ্ঠা ৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

রামেশ্বরও যশোমনু সিংহের সভাপণ্ডিতের কাজে নিযুক্ত হলেন ।

তাঁর কাব্যে পাওয়া যায় -

অজিত সিংহের তাত যশোমনু নরনাথ
রাজা রামসিংহের নন্দন ।
সিদ্ধি বিদ্যা রাজঋষি তাহার আজ্ঞায় বসি
রচে রাম গনেশ বন্দণ ।।[৭]

তিনি যশোমনু সিংহের বিদ্যোৎসাহিতা, দানশীলতা ও পরাক্রমের ভূয়সী প্রশংসা ও কল্যাণ কামনা করেছেন ।

আশুতোষ উমাপতি অর্চনা করিয়া যদি
অষ্টাহ মঈল কেহ শুনে ।
সেজন জীবনমুক্ত সর্ব্ব পাপপরিত্যক্ত
সর্ব্বাভিষ্ট সিদ্ধি অল্প দিনে ।।
হরিভক্তি সিদ্ধি হয় নাহি থাকে কোন ভয়
পরিচয় নানা উপাখ্যান ।
আরাধিয়া গৌরীহর রামেশ্বর মাগে বর
যশোমনু সিংহের কল্যাণ ।।[৮]

কবি কাব্যে যে কৌশিক নদীর নাম করেছেন, সেই নদীটিরই বর্তমান নাম কাঁসাই নদী । আর এই কাঁসাই নদীর তীরে কাপাসটিকরী গ্রামে কবির মাতুলালয় ছিল । রাজা রামসিংহ কবির বাড়ী করে দিয়েছিলেন কাঁসাই নদীর তীরেই । নদীর তীরবর্তী প্রাকৃতিক শোভা কবিকে আকৃষ্ট করে । নদীতে পল্লী বধুর স্নান, পল্লী বালক-বালিকার নদীতে সাঁতার কাটা, গ্রাম্য কৃষক ও মাঝিদের সারিগান কবিকে মুগ্ধ করতো ।[৯]

---

৭. শিব সঙ্কীর্তণ, পৃষ্ঠা ৩ ।

৮. ঐ পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ।

৯. ঐ ভূমিকা ।

Dhaka University Institutional Repository

এই দৃশ্য কবি প্রাণভরে উপভোগ করতেন। এতে কবির কবিপ্রতিভা আরো বিকশিত হয়ে তাঁকে আঠার শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। তাঁর কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত ভাষার চটক নেই সত্য, কিন্তু সহানুভূতি ও মানবিকতা তাঁর কাব্যে যেমন আছে, তা সমসাময়িক অন্যকোন কবির কাব্যে নেই। পাণ্ডিত্যে ও বৈদগ্ধ্যে কবির প্রতিটি কাব্যই সমৃদ্ধ। ১০

রামেশ্বর আসলে কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন তা সঠিক করে বলা যায় না; কেউ বলেন তিনি শক্তির উপাসক ছিলেন, আবার কারো কারো ধারনা তিনি শৈব ছিলেন। কবির গ্রন্থ অবলম্বন করে তাঁর ধর্ম নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাঁর রচিত 'শিব সঙ্কীর্ত্তণ পালা' এবং 'সত্যপীরের কথা' উভয় গ্রন্থেই ধর্মসমন্বয়ের সু-উচ্চ আদর্শ রচিত হয়েছে। রামেশ্বর ভট্টাচার্যের জীবনকাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কাব্যে উল্লেখিত সামন্তদের কাল ও অন্যান্য তথ্য বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক সুখময় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন - রামেশ্বর যে অন্তত ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তা সুনিশ্চিত।[১১] এমতই গ্রহণযোগ্য।

দুই. সামাজিক পরিবেশ

সে যুগে বাংলার যে আর্থিক চিত্র পাওয়া যায়, তাতে এদেশকে দরিদ্র মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এখান থেকে প্রচুর পরিমানে সূতীবস্ত্র, রেশম, চিনি এবং চাল রপ্তানি করা হত। অর্থনীতির যে কোন মাপকাঠিতে প্রাক্ পলাশী বাংলাকে স্বচ্ছল বলা যায়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এক প্রকার ছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। বিদেশি বেনেদের একচেটিয়া বাণিজ্য, মগ-হার্মাদদের লুণ্ঠন, সুবাদারের ঔদাসীন্য বাংলা থেকে দিল্লিতে সম্পদ পাচার বর্গীদের উৎপাত প্রভৃতির সমবায়িক যোগফল বাঙালীকে ধনেও কাঙাল, মনেও কাঙাল করে ছেড়েছিল।[১২]

---

১০. শ্রীসুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতা: ১৯৪০) পৃষ্ঠা ৮১৬।

১১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (কলকাতা: ১৯৮৮) দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ২৯৭।

১২. আহমদ শরীফ, <u>ইতিহাসের ধারায় বাঙালী</u>; বাঙলা-বাঙালী ও বাঙালীত্ব, (কলকাতা: ১৯৯২), পৃষ্ঠা ৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র মানুষের একটা অংশ দুর্ভিক্ষের সময় বা আর্থিক সংকটে আত্মবিক্রয় করত । স্ত্রী, পুত্র কন্যা বিক্রয়ের ঘটনাও বিরল নয় । এর একটাই কারণ ধন-বন্টনে বৈষম্য । যারা ধনী তারা অতিমাত্রায় ধনী; যারা গরীব তারা অতি গরীব; ধনের অসম বন্টন সমাজের নীচু তলার অতিদারিদ্র্য সৃষ্টি করেছিল । দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, ঝড়ে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এরা দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত । এ যুগে বাঙালীর আত্মবিশ্বাস, পৌরুষ ও সাহস দুঃসাহসিক কোন কাজকর্মে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা কম । সামাজিক ও আর্থিক সংস্কার, সামাজিক পরিবর্তন, নতুন কিছু উদ্ভাবণ এ যুগের বাংলায় দেখা যায় না । ইউরোপীয়দের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও ওদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, মানবিকতা, যুক্তিবাদ, প্রগতিশীল রাষ্ট্র চিন্তা বাঙালী জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি । [১৩] সামাজিক উন্নতির অনুকূল কোন নতুন মূল্যবোধ বা নতুন সামাজিক ব্যবহার নীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না । ইউরোপে এ সময় নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হচ্ছিল । ইউরোপের মানুষ বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং মহত্তর বুদ্ধি বিকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল । প্রতিবেশী এশীয় দেশ চীনে উন্নত ধরনের মুদ্রণ প্রযুক্তি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং ম্যাগনেটিক কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়েছিল । ঠিক একই সময়ে বাংলার মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত । চারপাশে কি ঘটেছে তার খবর রাখে না । বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতরা নব্যন্যায় ও অলংকারের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ও অনাবশ্যক যুক্তিজাল বিস্তার করে চলেছেন । হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা ঈশ্বর, ইহলোক-পরলোক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনুহীন বির্তকে প্রবৃত্ত । বাংলার বৈষ্ণব পণ্ডিতরা পরকীয়া ও স্বকীয়া প্রেমের মধ্যে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপনে নিয়োজিত । বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা কোরান ও হাদিসের সহস্রসুরকম ব্যাখ্যা, শরিয়ত ও সুন্নার টীকা-টিপ্পনী, সিয়া-সুন্নীর ধর্মাচারনে পার্থক্য, মোহাম্মদী ও হানাফিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ে ব্যস্ত । বাইরের জগৎ যুগানুকারী বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের অপেক্ষায়, ভাগ্য নির্ভর বাঙালীর মনো জগৎ জড়ত্বে, গতানুগতিকতায় পঙ্গুপ্রায় । [১৪] রামেশ্বর ভট্টাচার্য, এই সমসাময়িক সময়ের কবি বলেই সেই যুগের যুগ-প্রভাব তাঁর রচনায় এসেছে অনিবার্যভাবে ।

---

১৩. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক-পলাশী বাংলা, (কলকাতা: ১৯৮২), পৃষ্ঠা ১৬৮ ।

১৪. ঐ পৃষ্ঠা ১৬৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

সে কালের সমাজ চিত্র রামেশ্বরের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে । তিনি ছিলেন মিশ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধি । সেই সমাজকে তিনি নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষন করেছিলেন বলে তাঁর 'শিব সঙ্কীর্ত্তণ' কাব্যটিতে জীবন্তভাবে সে সময়ের সামাজিক জীবন ও পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে ।

কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যাক –

পার্বতীর গৃহস্থালী বর্ণনায় কবি একটি দরিদ্র বাঙালী পরিবারের সুন্দর অলেখ্য চিত্রিত করেছেন । এতে দেব-চরিত্রগুলো দেবত্ব বর্জিত হয়ে সাধারন লোভক্ষুধাতুর মানুষ্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে । শিবের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল রান্না করে পার্বতী উপবাসী স্বামী পুত্রকে পরিবেশন করছেন । এই চিত্রটির মধ্যে তৎকালীন একটি দরিদ্র এবং লোভী বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারের পরিচিত চিত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠে –

"তিন ব্যক্তি ভোজন একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চ মুখ পতি ।।
তিন জন একুনে বদন হইল বার ।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার ।।
তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায় ।
এই দিতে এই নাই হাড়ি পানে চায় ।।১৫

অসচ্ছল সংসারের একজন গৃহিনীর স্বামীর কাছে দুই গাছি শঙ্খ প্রার্থনার যে চিত্র কবি এঁকেছেন, তা সে সমাজেরই একজন অতি পরিচিত চরিত্র । তারপর পার্বতী পশুপতির কাছে তাঁর জীবনের একটি অতি গোপন দুঃখের কথা প্রকাশ করলেন, যে কথা একামত্র স্বামী ছাড়া আর কারও কাছে খুলে বলা যায় না । এ যে কত বড় লজ্জার কথা তা নারী ছাড়া অন্য কেউই বুঝতে পারবে না । কবি নারী মনের গোপন কথাটি তাঁর ভাষায় বলেছেন: —

লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয়া রই ।
হাত বাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই ।।১৬

সতের এবং আঠার শতকে জন্ম – বিয়ে ইত্যাদি উৎসব গুলির কোনটাকেই বাঙালী নিজেদের ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি । সমস্ত উৎসবে তারা সকল সংকীর্ণতাকে বিসর্জন দিয়ে তাদের দুয়ার খুলে দিতেন । বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজন, অনাহূত-রবাহূত সবার জন্য । সন্তানের জন্ম মঙ্গলের আনন্দে বাঙালী গৃহস্থ তাদের জন্মদিনে সবাইকে আহ্বান করতেন । তাঁর জন্ম উপলক্ষে আপন গৃহদ্বার উন্মুক্ত করে সমস্ত মানুষকে স্বাগত করতেন । এই উৎসবগুলো বাঙালী ব্যক্তিগত ঘটনায় পরিনত না করে সার্বজনীন উৎসবে পরিনত করতেন ।

---

১৫. শিব সঙ্কীর্ত্তণ, পৃষ্ঠা ১০৪ ।
১৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৮০ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাই 'শিব সঙ্কীর্ত্তনে' দেখতে পাই গৌরীর জন্ম উপলক্ষে হিমালয় -

দেখিয়া কন্যা মূর্ত্তি হিমালয় কৃতকীর্ত্তি
আপনে জানিয়া করে দান .
লোচনে প্রেমের ধারা কহে কেহ মোর পারা
ত্রিভুবনে নাহি ভাগ্যবান ।।[১৭]

সতের এবং আঠার শতকে বঙ্গদেশে কৌলিক প্রথার খুব বাড়াবাড়ি ছিল বলে মনে হয় । কুলীনের ছেলেকে কন্যার মাতা বিশেষ ভাবে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করতেন । কন্যা মোটা কাপড় মোটা ভাত পেলেই কৃতার্থ হবে, জামাইকে এ কথা বলতে শাশুড়ী দ্বিধাবোধ করতেন না । রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্য পাঠ করলে বোঝা যায় যে তৎকালীন সমাজে নৈতিকতার অভাব ছিল, তিনি তাঁর কাব্যের বহু জায়গায় নৈতিক অধঃপতনের চিত্র বর্ণনা করেছেন ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কবি মানসে সেই সমাজের প্রভাব সম্পূর্ণ রূপে ছিল । সহজাত কবিত্বশক্তিবলে তিনি সহজ-সরলভাবে সমাজের নিখুঁত চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে ।

তিন. কাব্য পরিচিতি :

রামেশ্বরের ভণিতায় মোট চারখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় --

১. সত্যপীরের কথা ।
২. শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ন ।
৩. শীতলা মঙ্গল বা মৃগপূজা পালা;
৪. সত্য নারায়ণের ব্রত কথা বা আখেটী পালা ।

এর মধ্যে শেষোক্ত দুই খানি কাব্য তাঁর রচনা নয় বলে মনে হয় । বোধ হয় তাঁর নামের আর কোন কবি কাব্য দুই খানি লিখে থাকবেন ।[১৮]

এখানে তাই সত্যপীরের কথা ও শিব-সঙ্কীর্ত্তনকে শুধু আলোচনায় গ্রহণ করা হচ্ছে ।

সত্যপীরের কথা : 'সত্যপীরের কথা' এর ভণিতা থেকে জানা যায় যে, কবি যখন যদুপুরে বাস করতেন সেই সময়ই এটি রচনা করেছিলেন ।

---

১৭. 'শিব সঙ্কীর্ত্তন', পৃঃ ৪৭ ।
১৮. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (কলকাতাঃ ১৯৯০) সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ ২২১ ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর গ্রন্থ থেকে তারই কথায় পাওয়া যায় -

" পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি বাম ।
সাকীন বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম ।।১৯

'সত্যপীরের কথা' এর রচনাকাল সঠিকভাবে জানা যায়নি ।তবে কবির আত্ম পরিচয় থেকে জানা যায় এই গ্রন্থখানি প্রথমে রচিত হয়েছিল ।

মধ্যযুগের শেষের দিকে বিরাজমান রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দুর্গতির কালে হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিতভাবে 'সত্য' নামক দেবতার কল্পনা করেছিল । তিনিই সত্যপীর ও সত্যনারায়ন নামে অভিহিত । এই চেতনার উন্মেষ ষোল শতকের শেষ পাদে, বিকাশ সতের শতকে এবং পূর্ণতা আঠার শতকে।২০

কাহিনী সংক্ষেপ :

একজন দরিদ্র কাঠুরিয়া ও এক বণিকের আখ্যায়িকা দিয়ে 'সত্যপীরের কথা'র কাহিনী আবর্তিত । যে ব্রাহ্মণের উপাখ্যান নিয়ে কথা আরম্ভ হলো তাঁর নিবাস দিল্লীর দক্ষিণদেশ মথুরেশপুর, নাম বিষ্ণুশর্মা। ব্রাহ্মণ ছিল খুবই দরিদ্র । একদিন অভুক্ত অবস্থায় বিকাল বেলায় বটবৃক্ষের নীচে বসে ব্রাহ্মণ শোক করছিল এবং আত্মহত্যা করার কথা ভাবছিল । এমন সময় মাধব পীর সেজে উপস্থিত হলেন । ফকিরের বেশধারী করুনাময় সত্যনারায়ণ কপট করে ব্রাহ্মণকে বললেন, বাবা, আমি উত্তম ফকির, আমার আর্শীবাদ গ্রহণ কর । বাবা তুমি দাতা তোমাক ধর্মাত্মা দেখছি, আমি ক্ষুধিত ফকির আমাকে কিছু আহার করাও, সমস্ত পৃথিবী দেখলাম সবাই ধর্ম ত্যাগ করেছে কেউ কোথাও একমুষ্ঠি ভিক্ষা দান করে না ।

ফকির সব কথা জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ নিজের দুঃখের কাহিনী বলে কাঁদতে লাগলো, অবশেষে বললো তুমি আমার পোশাক নিয়ে বিক্রি করে আহার কর । তাঁর এই মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে ফকির খুব খুশি হয়ে বললেন, পৃথিবীতে এমন সত্য প্রকৃতির মানুষও হয় । ফকির তখন ব্রাহ্মণকে

---

১৯. প্রাগুক্ত সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৫ ।

২০. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড, (ঢাকা: ১৯৮৩) পৃঃ ৮০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

বললো তোমার দুঃখ দূর করতে পারলেই আমি যথার্থ ফকির, তোমাকে এমন কিছু কৌশল শিখিয়ে দেব যে খুব তাড়াতাড়ি তোমার মঙ্গল হয়। সত্যপীরের চরণে হৃদয় নিবিষ্ট কর, ভগবান তোমার আশা পূর্ণ করবেন। ব্রাহ্মণ পীরকে তুষ্ট করতে আপত্তি করলে ফকির তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রভু একই, ধর্মের সারঅভেদ, রাম এবং রহিম একই, কেবল দুই নাম ধারন করে আছে। এরপর ফকির ব্রাহ্মণকে বিভিন্ন ভাবে আশ্বাস্ত করে পঞ্চরত্ন দান করেন এবং চতুর্ভুজরূপ ধারন করে আবির্ভূত হলেন। ওদিকে পিতৃবেশে অলঙ্কার, বস্ত্র, নানা সামগ্রী নিজের মাথায় বহন করে তাঁর কুঠিতে দেখা দেন। যখন ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরল সে সময় তার শ্বশুরের রূপধারী সত্যপীর নারায়ন নেই, তার প্রদত্ত সামগ্রীগুলো রয়ে গেছে।

অনেক আপত্তি নানা বিদ্রূপের পর, বিশ্বকর্মা ও সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়া দেখে বিশ্বস্ত হয়ে সবাই সত্যপীর নারায়নের পূজা দিতে আরম্ভ করলো এবং বিশ্বকর্মার বাড়ীর সামনে লোকে লোকারন্য হলো। পীরের সিন্নি খাবার পর দরিদ্র কাঠুরিয়ার দারিদ্র মোচন হল। এত গেল ভাল দিক, অপর পক্ষে সিন্নি দিতে ভুলে গেলে কিরকম শাস্তি হয় তার দৃষ্টান্ত সদানন্দ বেনে। এই বণিক সন্তান কামনায় সত্যপীরের সিন্নি মেনেছিল। পীরের কৃপায় সদানন্দের কন্যা হলো, কন্যা বড় হলে তার বিয়েও হলো কিন্তু যে কারনেই হোক সদানন্দের মানত রক্ষা হয় নাই। এক সময় বণিক জামাতাকে নিয়ে বাণিজ্য করতে বের হলেন। সেখানে রাজার সাথে বেচাকেনা হলো, রাজার অতিথি হয়ে সমাদরে শ্বশুর জামাতা বাস করতে লাগলেন, দীর্ঘদিন পরও সিন্নি না পেয়ে অবশেষে ফকিরের মনে হলো বণিককে শিক্ষা দিতে হবে। ফকিররের শাস্তি স্বরূপ রাজ কোষের চোরাইমাল পরদিন সদাগরের নৌকায় পাওয়া গেল, অমনি কোটাল শ্বশুর জামাতাকে বেঁধে নিয়ে কারাগারে পুরল। অনেকদিন কারাবাসের পর বণিকের স্ত্রীর সিন্নি মানত করাতে ফকির খুশি হলো এবং তাঁর কৃপায় বণিক এবং জামাতা রাজার কাছ থেকে আগের চেয়ে দশগুন বেশী সম্পদসহ মুক্তি পেলো এবং মহা আনন্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করলো। এদিকে তাদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ শুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে বণিক কন্যা সিন্নি ফেলে রেখে এসেছিল। এতে ফকির পুনরায় অসন্তুষ্ট হলে বণিক কন্যার স্বামীকে নৌকায় আসার সময়ই মৃত্যু হয় এবং সবাই এজন্যে দুঃখে অধীর হয়ে বিলাপ করতে থাকে। অবশেষে বণিক কন্যা ফেলে আসা সিন্নি খেলে ফকির জামাইকে পুর্নজীবিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

'সত্যপীরের কথা'র ঘটনার মধ্যে দেবতার মহত্ব নাই, মানুষের লঘু চরিত্রের পরিচয় আছে । এর কাহিনীতে রামেশ্বর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসরন করেছেন, সত্যদেবের চিত্র তেমন দেবতুল্য হয় নাই । তার চরিত্র সাধারণ মানবের দুর্বলতা অর্পিত হয়েছে । সত্যপীরের চিত্রে রামেশ্বর আর একটু রং ফলিয়েছেন । গ্রন্থের মধ্যে ধর্ম সমন্বয়ের উচ্চ আদর্শ রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায় । গল্পটির আখ্যানগত গুরুত্ব সামান্যই, উপরন্তু কবি এতে মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগরের কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সুতরাং এতে মৌলিকতা দেখাবার অবকাশ কম । কাব্য হিসেবে এর মর্যাদা স্বীকার করা যায় না ।[২১]

শিব সঙ্কীর্ত্তন বা শিবায়ণ ঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিব সঙ্কীর্ত্তন মঙ্গলকাব্যের অনুভুক্ত । রামেশ্বর তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' পালা । পরবর্তীকালে এর নাম হয়েছে 'শিবায়ণ' । সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে দেশবাসী রামায়ণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে রামায়ণেরই অনুকরণে এর নাম দিয়েছে শিবায়ণ ।[২২]

শিব কাহিনীর পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান মিশিয়ে রচিত 'শিবায়ণ' বা 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' শিব মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ।[২৩]

গ্রন্থটির রচনাকাল সুনির্দিষ্ট করে বলা যায়না । ডঃ আহমদ শরীফ (১৭০১-১৭০২) খ্রীষ্টাব্দ,[২৪] ডঃ সুখময় মুখোপাধ্যায় (১৭১১-১৭১২)[২৫] ডঃ সুকুমার সেন (১৭১০-১৭৪১) খ্রীষ্টাব্দকে কাব্যরচনা সমাপ্তির কাল বলে মনে করেন ।[২৬]

শিব সঙ্কীর্ত্তন, পাকা হাতের রচনা । এই কাব্যটি রচনার শুরুতে রাজা যশোমন্ত সিংহ তাঁকে অনুপ্রেরণা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন । পালার গল্পটি মৌলিক না হলেও চরিত্র সৃষ্টি ও রচনা কৌশলে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ।

প্রথম দুই পালায় মোটামুটি পৌরাণিক শিব কাহিনী অনুসৃত হলেও চতুর্থ পালার কিছু অংশ থেকে শিবের লৌকিক কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে । অবশ্য মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনীও মিশাল আছে । সপ্তম এবং জাগরণ মোট আট পালায় কাব্যের সমাপ্তি ।

---

২১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, পৃঃ ২২১ ।
২২. 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' ভূমিকা ।
২৩. শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, (কলকাতাঃ ১৯৮৯) পৃঃ ২২৩ ।
২৪. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা একাডেমী) পৃঃ ৭৯৪ ।
২৫. ডঃ শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম (কলকাতা ঃ ১৯৮৮) পৃঃ ২৯৬ ।
২৬. ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা ঃ ১৯৪০) পৃঃ ৪৪২ ।

Dhaka University Institutional Repository

শিব সঙ্কীর্তনের কাহিনী :

শিবের দরিদ্রের সংসার, অভাবে দিন চলে না। শিব ভিক্ষাবৃত্তি করে কোন রকমে সামান্য তণ্ডুল সংগ্রহ করে আনেন। আর তা পতিপরায়ণ গৌরী অতি যত্নে নানা রকম ব্যঞ্জন রান্না করে স্বামী ও পুত্রদের তৃপ্তির সাথে ভোজন করান। এই অবস্থায় সংসার কি ভাবে চলবে তা ভেবে গৌরী উদ্বিগ্ন হন। অবশেষে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য স্বামীকে ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকাজ করার পরামর্শ দেন। গৌরীর পরামর্শে শিব কৃষিকাজে মনোযোগ দিলেন এবং তাঁদের দৈন্যের উন্নতি হলো। এদিকে মর্ত্যলোকে চাষের কাজে শিব এমনই মত্ত হয়েছেন যে, কৈলাসে ফেরার কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেছেন। মর্ত্যলোকে তাঁর কতগুলো সঙ্গিনী জুটেছিল এবং চাষের ফসলের লোভে শিবের দিন কাটছিল ভালই। সতী রমনী গৌরী-দীর্ঘদিন স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে নারদের পরামর্শে মর্ত্যে শিবকে বিরক্ত করার জন্য নানা রকম পদ্ধতি আরোপ করলেন এবং ব্যর্থ হলেন। সব ধরনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় পার্বতী বাগদিনীর বেশ ধারন করে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে শিবের ধানক্ষেতে মাছ ধরতে আরম্ভ করলেন, এবং তাতে ধান নষ্ট হতে লাগলো। ছদ্মবেশী বাগদিনীর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে শিব তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মূল্যবান অঙ্গুরীটিও দিয়ে দেন। এই সময় বাগদিনী রূপী পার্বতী কৈলাসে ফিরে আসেন। শিবের পার্বতীর জন্য মন চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং তিনিও কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অঙ্গুরীর প্রসংগ নিয়ে হর-পর্বতীর মধ্যে কলহ বাঁধে, এবং দেবর্ষি নারদের হস্তক্ষেপে তাঁদের দ্বন্দ্বের কিছুটা মীমাংসা হয়। কিন্তু কলহ প্রিয় নারদ তাঁদের কলহকে তারেকটু ঘোরালো করার জন্য পার্বতীকে স্বামীর কাছে এক জোড়া শঙ্খ চাইতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শে পার্বতী শিবের কাছে এক জোড়া শঙ্খ প্রার্থনা করেন। ভিখারী শিব পাবতীর সাধ পূর্ণ না করায় পার্বতী অভিমান করে তাঁর পুত্রদেরকে নিয়ে বাবার বাড়ী চলে যায়।

এই অবস্থায় শিব খুব বিপদে পড়েন এবং নারদের সহযোগিতায় শাঁখারির বেশে পার্বতীর বাবার বাড়ী গিরিরাজপুরে গিয়ে গৌরীকে নিজেই শাঁখা পরিয়ে দেন। তখন শিবানীর অভিমান দূর হয় এবং শিব সপরিবারে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন করেন।

পালার গল্পটি মৌলিক নয়, তবে চরিত্র সৃষ্টি এবং রচনা কৌশলে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রথম দুইটি পালায় মোটামুটি পৌরাণিক শিব-কাহিনী অনুসৃত হলেও চতুর্থ পালার কিছু অংশ থেকে শিবের লৌকিক কাহিনী অবলম্বিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিবায়ন কাব্যের লৌকিক কাহিনীর জড় অনেক প্রাচীন । শিব আদিযুগের কৃষি নির্ভর সমাজের উপাস্য দেবতা । লৌকিক শিব-কাহিনীতে নীতি ও আদর্শের পালিশ পড়ার অবকাশ ঘটেনি । রামেশ্বর শিবের দরিদ্র জীবনের বর্ণনায় যে বাস্তব বোধের পরিচয় দিয়েছেন, মুকুন্দরামকে ছেড়ে দিলে মধ্যযুগের আর কোন বাঙালী কবির কাব্যে তাঁর মত দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কৃষি জীবনের সাথেও রামেশ্বরের নিগূঢ় পরিচয় ছিল । বিশেষত রাঢ়ের ধান-চাল সম্বন্ধে সম-সাময়িক বৃত্তান্ত হিসেবে তাঁর বিবরণী অমূল্য ইতিহাসের খনি বলে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য ।

রামেশ্বরের 'শিব সঙ্কীর্ত্তন ' কাব্যে রাজসভার বা নাগরিকতার বিলাস তেমন নেই । বাংলার দরিদ্র শ্রেণীর দুঃখ বেদনা, হাসি কান্না যথাযথভাবে প্রকাশ পেয়েছে কাব্যে । সমাজচিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সংযম ও সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন । কবির কাব্য অনায়াস-সুন্দর, সহজ সরল গ্রাম্যতা দোষমুক্ত । এতে চটকতার লেশমাত্র নেই । শিবের লৌকিক কাহিনীর পরিকল্পনায় রামেশ্বর স্বকীয় মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন ।

শিব সঙ্কীর্ত্তন কাব্যে মানব রস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, এই কাব্যে বিলাসিতার চিত্র নেই, আছে সরল অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিচ্ছবি ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য উচ্চতর চরিত্র মহত্তর আদর্শ প্রভৃতি সৃষ্টি করতে না পারলেও শিব-দুর্গার চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই অংকন করেছেন । তাঁদের মহিমা মানববোধের তলায় চাপা পড়ে গেছে । আঠার শতকের যুগ-প্রভাবে মঙ্গল কাব্যের দেব দেবীরা স্বর্গ-লোক ছেড়ে বাংলার পথে-প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তা শিব-সঙ্কীর্ত্তন কাব্য থেকেই বোঝা যায় । [২৭]

কবির রচনারীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শব্দ বিশেষের প্রতি দুর্বলতাহেতু সে শব্দের বহুল ব্যবহার ও অলঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাসের প্রতি আসক্তি । কাব্যে করুন রস অবতারনার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করেননি । রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে কবির অনুভূতি অত্যন্ত সচেতন এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ।

---

২৭. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, সপ্তম সংস্করণ, (কলিকাতা: ১৯৯০) পৃষ্ঠা ২২২-২২৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

রুক্মিনীর রূপ বর্ণনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক ।

" সুমধ্যমা ধনী রূপিনী রুক্মিনী
অদ্ভুত যেন সুরমায়্যা ।
ধীরাধীরগম কবি বিমোহন
শোভন সুন্দর কায়া ।।
রবিশশি খণ্ডিত কুণ্ডল মণ্ডিত
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা । ২৮

পারিপার্শ্বিক জগৎ, জীবন এবং দৈনন্দিক অভিজ্ঞতা থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন তিনি । রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদি ইত্যাদি শাস্ত্র কবির নখ দর্পনে ছিল । পুরানাদি শাস্ত্রে যে ব্যাপক অধিকার ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় কাব্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখে । অনিরুদ্ধ, অশ্বমেদ, যজ্ঞ, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, গরুর ভীম, সুরসতী, রথ, রম্ভা, রাধা নারদ ইত্যাদি পৌরানিক চরিত্রের নাম কবির কাব্যের প্রায় প্রতিটি চরণে ছড়িয়ে আছে । এছাড়াও কবি তার কাব্যগুলিতে অনেক প্রবাদ ও প্রবচনও ব্যবহার করেছেন ।

১। দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা ।

২। পুণ্যি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল ।

উর্দু ও ফারসী ভাষায়ও যে তাঁর দখল ছিল - ' সত্যপীরের কথা ' কাব্য তার প্রমান দেয়, সত্যপীরের জবানীতে তিনি অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে ফারসী ও হিন্দি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছন । সেকালের কৃত বিদ্য সবাইকে অবশ্য রাজভাষা ফারসী শিখতে হতো জীবিকার প্রয়োজনে । বাংলা ব্যতীত সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর পান্ডিত্য ছিল । সেই পান্ডিত্যের পরিচয় আছে শব্দচয়ণে ও কাব্যশৈলী নির্মানে । পান্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্য কাব্যে এক প্রকার সুরুচির জন্ম দিয়েছে, যা সমসাময়িক অনেকের রচনায় পাওয়া যায়নি । সেজন্য ' ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভনে রামেশ্বর' কবির উক্তিটি অসংগত নয় ।

---

২৮. ' শিব সঙ্কীর্তন ' পৃঃ ১৬০ ।

Dhaka University Institutional Repository

" দ্বিতীয় অধ্যায় "

মধ্যযুগের কাব্যে অলংকার ব্যবহারের ঐতিহ্য

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের দীর্ঘ সময়ে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে সে যুগের প্রধান সাহিত্যকর্মগুলি নিম্নরূপ :-

ক) বৈষ্ণব পদাবলী,

খ) প্রণয়োপাখ্যান বা রোমান্স কাব্য,

গ. মংগলকাব্য,

ঘ. পৌরাণিক মহাকাব্যের অনুবাদ ও

ঙ. ইসলাম ধর্ম বিষয়ক কাব্য।

মধ্যযুগের সব কাব্যেই বিষয়ের পাশাপাশি আংগিক প্রসাধনে যত্ন নেয়া হয়েছে। কবিরা সর্ব প্রকার অলংকার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিভা ও বিষয়ের অনুরোধে অলংকার ব্যবহারে তারতম্য থাকলেও সচেতনভাবে তারা কবিতার বহিঃরংগকে অলংকার ব্যবহার করে সৌন্দর্যমন্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই আলোচনা করা যাক বৈষ্ণব পদাবলীতে অলংকারের প্রয়োগ সম্পর্কে।

বৈষ্ণব পদাবলী :

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদকর্তারা হলেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, এবং গোবিন্দদাস প্রমুখ। তাঁরা তাদের পদগুলিতে অলংকার ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথে। নানা রকম অলংকার প্রয়োগের ফলে বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য কাব্য রসিকদের কাছে খুব উপাদেয় হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস সংস্কৃত অলংকরন রীতি গ্রহন করেছেন। চন্ডীদাস ও জ্ঞানদাস সহজ-সরল রীতি গ্রহন করেছেন। বৈষ্ণব কবিদের ভাবের ঐশ্বর্য যেমন সুগভীর, অলংকার প্রয়োগের ক্ষমতায় তেমনি বিস্ময়কর। বৈষ্ণব সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য দরবারে এই জন্যই একটি আসন করে নিয়েছে। বৈষ্ণব পদকর্তাগন শব্দালংকার এবং অর্থালংকার

Dhaka University Institutional Repository

দুই - ই ব্যবহার করেছেন তাঁদের পদগুলিতে । শব্দালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব সাহিত্যে অনুপ্রাসের প্রাধান্য । তাঁদের পদগুলিতে বিবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে ।[১]

অনুপ্রাস :

কবি বিদ্যাপতি (আনু : ১৩৮০- ১৪৬০) চমৎকার অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন তাঁর বিভিন্ন পদে । তাঁর রচনায় অনুপ্রাস ও শব্দমাধুর্য লক্ষনীয় —

১. রচনক চাতুরী লহু লহু হাস ।
ধরনীয়ে চাঁদ করল পরগাস ।। (বিদ্যাপতি, পৃ : ৮৫)

২. ক্ষনে ক্ষনে নয়ন কোন অনুসরই ।
ক্ষনে ক্ষনে বসনধূলি তনু ভরই ।। (ঐ পৃ : ৮৫)

৩. জাতকি কেতকি কুসুম সুবাস ।
ফুলরস মনমথ তেজল তরাস ।। (ঐ পৃ : ৬৪)

৪. হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার ।
দেহক সরবস গেহক সার ।। (ঐ পৃ : ২৪৯)

৫। বিদ্যাপতি কবি কহই ।
প্রেমহি কুলবতী পরাভব সহই ।। (ঐ পৃ : ১৫৮)

চন্ডীদাসও নানাবিধ অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন, কতপয় দৃষ্টান্ত —

১। কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে ।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি গোঠ গোকুলে ।। (চন্ডীদাস পৃঃ ১১৯)

---

১. উদাহরন দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা', মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ শরীফ সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৩৭৫), পরিবর্ধিত সংস্করণ ।

Dhaka University Institutional Repository

২. এ ছার নাসিকা মুই যত করু বন্ধ ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ ॥ (চন্ডীদাস পৃঃ ১৩৩)

৩. সব দুখ আজি গেল হে দূরে ।
হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ (চন্ডীদাস, পৃঃ ২৪৪)

৪. এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি
পরানে পরানে বান্ধা আপনা-আপনি । (ঐ পৃ ঃ ১৮১)

এ রকম অনুপ্রাস ছড়িয়ে রয়েছে চন্ডীদাসের বিভিন্ন পদে ।

চৈতন্য পরবর্তী ষোল শতকের কবি জ্ঞানদাস । তাঁর পদগুলো সরল এবং আনুরিক। এই সারল্য এবং আনুরিকতা যা শ্রেষ্ঠ কবিতার ধর্ম চন্ডীদাসের মতো তাঁর পদেও প্রচুর পাওয়া যায় । তাই তাঁর সাথে চন্ডীদাসের সাদৃশ্য অনেক বেশী । অলংকার ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনিও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । দুই ধরনের অলংকারই তিনি দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করেছেন । শব্দালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনিও অনুপ্রাসের প্রতি আসক্ত ছিলেন । জ্ঞানদাসের দুটি একটি বাৎসল্য রসের পদে চমৎকার অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত রয়েছে ——

১. রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুনে মন ভোর ।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অংগ মোর ॥ (জ্ঞানদাস পৃ ঃ ৯১)

২. গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী-সংগে ।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসংগে ॥ (ঐ পৃ ঃ ৯১)

৩. জ্ঞানদাস বলে, সখি ! সেই সে করিব,
কানুর পিরীতি লাগি সাগরে পশিব । (ঐ পৃ ঃ ৯২)

৪. চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখতুলি ।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি ॥ (ঐ পৃ ঃ ১৯৮)

Dhaka University Institutional Repository

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গোবিন্দদাস জীবিত ছিলেন। গোবিন্দদাসের অভিসারের পদগুলি চমৎকার। জ্ঞানদাস যেমন চন্ডীদাসকে অনুসরন করেছিলেন, তেমনি গোবিন্দদাসও বিদ্যাপতির পদাংক অনুসরন করেছিলেন। গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ পদ গুলি ব্রজবুলিতে রচিত। বাক্‌মাধুরী, চিত্রকল্প, সংগীত ধর্ম এবং আবেগের কথা ধরলে গোবিন্দদাসকে মধ্যযুগের অনেক বড় মাপের কবি বলে মনে হয়। গোবিন্দদাসের শব্দালংকারের দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুপ্রাস। বিবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো:——

১. শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ।।
(গোবিন্দদাস পৃঃ ১৫১)

২. মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শংকিল পংকিল বাট ॥
(ঐ পৃ ঃ ১৫২)

৩. দশ দিশ দামিনী দহন বিথার। (ঐ পৃ ঃ১৫২)

৪. দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ ॥
(ঐ পৃ ঃ ৭৪)

৫. যাঁহা যাঁহা ভাংগুর ভাংগু বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল ॥
(ঐ পৃঃ ৮৪)

এভাবে দেখা যায় অনুপ্রাস নির্মানের ক্ষেত্রে বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস এঁরা প্রত্যেকেই পারদর্শী ছিলেন।

বৈষ্ণব পদাবলীতে যমকের ব্যবহার:——

১. নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অংগ
(গোবিন্দদাস , পৃঃ ৫৭)

২. দিনে দিনে অনংগ অগোরল অংগ ॥ (বিদ্যাপতি , পৃঃ ৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি। (চন্ডীদাস, পৃ : ১০৩)

৪. আকুল শরীর মোর বে আকুল মন। (ঐ পৃ : ১১৯)

৫. আয়র ঝরএ মোর নয়নের পানী। (ঐ পৃঃ ১১৯)

৬। মউর মউরিগন ঘন দেই নাদ। (গোবিন্দদাস, পৃঃ ১৪৭)

৭. অব জনি সজনি করহ বিচার। (ঐ পৃ : ১৫৪)

৮। অংগহি অংগ অনংগ ভরিপুর। (ঐ পৃঃ ১৬৩)

৯. কি কহব হে সখি কহইতে লাজ (জ্ঞানদাস, পৃঃ ১৬৯)

১০. হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাসো। (চন্ডীদাস, পৃঃ ১৮৬)

১১. তরুকুল মুকুলিত, অলিকুল ধাব। (জ্ঞানদাস, পৃঃ ২০৫)

১২. জলদ-কলপ - তরু তরুনি - সমাজ ।। (গোবিন্দদাস, পৃঃ ৬৭)

বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদে তিন ধরনের অর্থাৎ আদ্য, মধ্য এবং অনু যমক নির্মানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। শব্দালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুপ্রাস এবং যমক ব্যবহার ছাড়াও পদকর্তারা শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি অলংকারও ব্যবহার করেছেন। তবে বৈষ্ণব পদকর্তারা অর্থালংকার ব্যবহারেই বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁরা অর্থালংকারের প্রধান প্রধান প্রায় সবগুলো অলংকারই প্রয়োগ করেছেন দক্ষতার সাথে। তাঁদের সৃষ্ট শব্দাবলংকারের চেয়ে অর্থালংকারই বেশী উজ্জ্বল। শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের পদ থেকে অর্থালংকার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথমেই উদাহরন দেয়া যাক ' উপমা ' অলংকারের ——

উপমা অলংকার প্রয়োগে বৈষ্ণব কবিদের দক্ষতা অপরিসীম:

১. যেমন — জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল
তত হি বয়ন সুছন্দ।
দাম চম্পকে কাম পুজল (বিদ্যাপতি, পৃঃ ১১২)
জইসে সারদ চান্দ ।।

Dhaka University Institutional Repository

২. চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই (চন্ডীদাস, পৃঃ ১৮৮)

৩. কন্টক গাড়ি কমল-সম পদতল
মঞ্জীর চিরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল (গোবিন্দদাস পৃঃ ১৩৬)
চলতহি অংগুলি চাপি ॥

৪. পুরতি মনোরথ গতি অনিবার
গুরুকুল-কন্টক কি করয়ে পার। (গোবিন্দদাস পৃঃ ১৬৩)
সুরত শিংগার - কি রিতি -সম ভাস
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥

৫. কুসুমে মধুপ কহি- সেহো নহে তুল
না আইসে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।
কি ছার চকোর চাঁদ - দুহুঁ সম নহে
ত্রিভুবনে হেন নাহি চন্ডীদাস কহে। (চন্ডীদাস, পৃঃ ১৮২)

৬. গোবিন্দদাসে কয় মৃত তরু মুঞ্জরয়
(যেন) বসন্ত ঋতু পরকাশে।। (গোবিন্দদাস, পৃঃ ২৪৩)

উৎপ্রেক্ষা :

১. কুলবতী হইয়া কুলে দাড়াঞা
যে -ধনী পিরীতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া (চন্ডীদাস পৃঃ ১২৭)
এমতি পুড়িয়া মরে।

২. বচনক চাতুরী লহু লহু হাস।
ধরনীয়ে চাঁদ করল পরগাস।। (চন্ডীদাস, পৃঃ ১২৭)

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিম্বফল যিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর । (চন্ডীদাস, পৃঃ ৬৩)

৪. নীল নলিনী জনু শ্যাম রস সায়রে
লখই ন পারই কোই ।। (গোবিন্দদাস পৃঃ ১৫৫)

৫. দয়া করি চাতকীরে পিপাসা করিতে দূরে
ধায় যেন নবজলধর ।। (গোবিন্দদাস ,পৃঃ ২৪৩)

৬. ভুজে ভুজে বেড়ি দোঁহার নয়ানে নয়ন ।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ।। (ঐ পৃঃ ১৩৭)

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা :

৭. কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর ।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
সুরধুনী - তীরে উজোর ।। (গোবিন্দদাস, পৃঃ ৫১)

২. অপরূপ পেখলুঁ রামা ।
কনকলতা অব- লম্বনে উয়ল
হরিন-হীন হিম-ধামা ।।
নয়ন নলিনি দৌ অঞ্জনে রঞ্জল (বিদ্যাপতি, পৃঃ ১১০)
ভাংগ বিভংগি-বিলাস ।

রূপক :

১. দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল ।
অকূল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ।। (গোবিন্দদাস, পৃঃ ১৭৫)

২. দোঁহে দোঁহা দরশনে ভাবে বিভোর ।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দলোর ।। (ঐ পৃঃ ১৭৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩. দোঁহার অধর - মধু দুহুঁ করু পান ।
নিজ অংগে দিল রাই ঘন রস দান । (ঐ পৃঃ ১৩৭)

৪. চকিত চকোর জোড় বিধি বান্ধল
কেবল কাজর পাশ ।। (বিদ্যাপতি পৃঃ ১১১)

৫. কাম- কম্বু ভরি কনয়া শম্বু পরি
ঢারত সুরধুনি -ধারা ।। (ঐ, পৃঃ ১১৩)

বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত বিখ্যাত পদটি নিরংগ রূপকের দৃষ্টান্ত :——

হাথক দরপন মাথক ফুল ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ।।
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার । (বিদ্যাপতি, পৃঃ ২৪৯)
দেহক সরবস গেহক সার ॥

দৃষ্টান্ত :

১. অংকুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে ।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে ।। (বিদ্যাপতি পৃঃ ২২৫)

২. এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া-লেহে ।।
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা ।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দুর করব পিয়াসা ॥ (বিদ্যাপতি, পৃঃ ২২৫)

Dhaka University Institutional Repository

অতিশয়োক্তি :

১. চিন্তামনি যব নিজগুন ছোড়ব
কি মোর করম অভাগি ।।
শ্রাবন মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে । (বিদ্যাপতি পৃঃ ২২৫)

২. যাঁহা যাঁহা ভাংগুর ভাংগু বিলোল ।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিলোল (গোবিন্দদাস পৃঃ ৮৪)

৩. চন্দন - তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি । (বিদ্যাপতি, পৃঃ ২২৫)

বিশেষোক্তি :

সোই মধুর বোল শ্রবনহি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ।। (কবি বল্লভ পৃঃ ২৫৩)

সমাসোক্তি ব্যবহার :

382699

সখিরে, অবহুঁনা আয়ল নাহ ।
দুরনু বসনু আগুসার ভেল
কো সহ মদনকি দাহ ।। (বিদ্যাপতি , পৃঃ ২২৮)

ব্যতিরেক :

১. নন্দ- নন্দন চন্দ-চন্দন
গন্ধ - নিন্দিত - অংগ । (গোবিন্দদাস, পৃঃ ৫৭)

২. রূপে গুনে রস - সিন্ধু মুখ - ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে । (জ্ঞানদাস, পৃঃ ১১৫)

Dhaka University Institutional Repository

৩. ননী জিনি সুকোমল দুখানি চরনতল
কোথা পড়ে নাহিক ঠাহর। (গোবিন্দদাস ,পৃঃ ২৪৩)

৪. এতেক সহিল অবলা ব'লে ।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥ (চন্ডীদাস, পৃঃ ২৪৪)
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল ।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥

অপ্রস্তুত প্রশংসা :

নয়নের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালের উপরে কাল ।
প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিলাম, (চন্ডীদাস পৃঃ ১৮৭)
দিন যাবে আজ ভাল ॥

বিষম অলংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখি চন্ডীদাসের পদে : ———

১. কত দুখ কহিব কাহিনী
দহ বুলী ঝাঁপ দিলো সে মোর সুখাইল
মোঞ্জ নারী বড় অভাগিনী (চন্ডীদাস).

২. সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল ।
অমিয়- সাগরে সিনান করিতে (জ্ঞানদাস, পৃ, ১৩৩)
সকলি গরল ভেল ॥

চন্ডীদাসের ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস সহজ রীতিতে পদ রচনা করেছেন । তাঁর পদেও অর্থালংকারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । উল্লেখিত পদটিতে বিষম অলংকারের প্রয়োগে রাধার মনের ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

অসংগতি অলংকারের উদাহরন : —

১. সই কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল ।
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াঞা
যে ধনী পিরীতি করে
তুষের অনল যেন সাজাইয়া
এমতি পুড়িয়া জরে ॥ (চন্ডীদাস পৃঃ ১২৭)

২. আরো অপরূপ কহিতে নারি ।
যথা মেঘ না তথা বহে বারি ॥ (জ্ঞানদাস ,পৃঃ ৬৫)

প্রনয়োপাখ্যান বা রোমাস কাব্য :

রোমান্স কাহিনীর উৎস বৃহত্তর ভারতীয় উপমহাদেশ; এমন কি ভারতের বাইরেও তা সম্প্রসারিত । রোমান্স কাহিনী প্রধানত মধ্যযুগের ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেনীর কাহিনী । রোমান্স কাহিনীকাব্য বর্ণনামূলক বস্তুনিষ্ঠ কাব্য । কিন্তু সেটি সীমাবদ্ধ অর্থে, কারণ এ সব কাব্যের মূল লক্ষ্য গল্পের মাধ্যমে রসবিতরন, দ্বিতীয়তঃ অনুবাদ এবং মূলের আলোকেই বিচার্য ।

রোমান্স কাব্যগুলিতে অলংকারের অঢেল ব্যবহার দেখা যায় । উপমা অলংকারের দিকটা সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে রূপ বর্ণনার অংশ বিশেষে । এছাড়া ও অনুপ্রাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা শ্লেষ, শব্দশ্লেষ, , উল্লিখন, কবি-প্রসিদ্ধি ইত্যাদি অলংকারের সমাবেশ রয়েছে রোমান্স কাব্যগুলিতে । তাঁরা অলংকার প্রয়োগে আলাদাভাবে প্রয়াসী হননি, এগুলো এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই । রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যগুলিতে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার উভয় অলংকারই ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন । তবে রোমান্স কাব্যের কবিদের অনুপ্রাসের প্রতিই আসক্তি বেশী । প্রনয়োপাখ্যান গুলিতে অনুপ্রাসের প্রচুর সমাবেশ তাই মনে করিয়ে দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

গল্প পরিবেশনে তাঁদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । গল্পের মাধ্যমে প্রেমের চিত্রাংকনে ও তাঁরা দক্ষতা দেখিয়েছেন । যে কালে উপন্যাস ছিল না , সে কালে রোমান্সের খুব জনপ্রিয়তা ছিল । প্রণয়োপাখ্যান গুলির উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন আলাওল (১৫৯৭ -১৬৭৩), দৌলত উজীর বাহরাম খান (ষোড়শ শতক), মুহম্মদ কবীর (ষোড়শ শতকের শেষার্ধে) এবং দৌলৎ কাজী (১৬০০ -১৬৩৮) , নওয়াজিশ খান , কোরেশী মাগন ঠাকুর (১৬০১-১৬৬০), আব্দুল হাকিম (১৬২০- ১৬৯১) প্রমুখ ।

ক. শব্দালংকার

শব্দালংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখানো যাক বিবিধ অনুপ্রাসের ব্যবহার : ——

পদ্মাবতী কাব্যে[২] বিবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত : ——

১. সুগন্ধি সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে ।
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে ।। (পৃ: ৩)

২. সপ্ত সর্গ সপ্ত মহী বৃক্ষপাত যত ।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় কাগত ॥ (পৃ : ৯)

৩. নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দী হৈল ।
পাখাশূন্য করিয়া পেটারি মাঝে থুইল ॥ (পৃ : ৭৯)

---

২. আলাওল, পদ্মাবতী, ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত ,(ঢাকা :১৩৫৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৪. সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল ।
যাকে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল ॥ (পৃ : ১৫)

৫. গর্ভ পাপ পয়োধর না হয় গোপন
কাল পূর্ণ হৈলে হয় বেকত আপন ।। (পৃ : ১৭)

লায়লী মজনু কাব্যে [৩] বিবিধ অনুপ্রাসের ব্যবহার : ——

১. নৃত্যগীত নট-রঙ্গ যজ্ঞ জথ ইতি ।
পুরাল পিতাবর পুত্রের আরতি ॥ (পৃঃ ১৭)

২. পটেতে বিচিত্র রূপ দিলেন্থ লিখিয়া ।
ভাবেতে বাড়িল ভাব সুন্দর দেখিয়া ॥ (পৃ : ১৭)

৩. অক্ষর না হয় সব ব্যঞ্জন বর্জ্জিত ।
পড়িয়া প্রেমের পাঠ হইলা পন্ডিত ॥ (পৃঃ ৩২)

৪. জননী দেখিলা যদি পুত্রের বদন ।
বিকুল আকুল হইয়া করিলা রোদন ।। (পৃঃ ৫০)

মধুমালতী কাব্যে [৪] অনুপ্রাসের ব্যবহার : ——

১. এথেক বুলিয়া পরী কথ দূর গেল ।
কথক্ষনেক রাজকন্যার নিদ্রামোহ পেল ॥ (পৃঃ ৭)

২. নিদ্রার আলস্য ছাড়ি মেলিল নয়ান ।
ভিন্ন ভিন্ন দেখে সব মন্দির ভিন্নস্থান ॥ (পৃ : ৭)

---

৩. দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী-মনজু, আহম্মদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৫৭) প্রথম সংস্করণ ।

৪. মুহম্মদ কবীর, মধুমালতী, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৩৬৬) ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. মোহাম্মদ কবীরে কহে কুমার আলাপ ।
মনোহর ভাবে মধুমালত বিলাপ ।। (মধুমালতী, পৃঃ ১৩)

৪. কুলের কলঙ্ক তুমি রাখিলা কুমারী । (ঐ পৃঃ ১৪)

৫. চারিপাশে চান্দোয়ার চামর দোলয় ।
থোপা থোপা মনি-মুক্তা তাহাতে শোভএ ।। (ঐ পৃঃ ২২)

সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্যে [৫] বিবিধ অনুপ্রাসের ব্যবহার ঃ—

১. গাহিতে গাহিতে শব্দ গেল সুরপুর ।
সুরপতি সুরলোক শ্রবণে মধুর ।। (পৃঃ ৫০)

২. নির্জন কাননে যদি রহিল রাজন ।
নারী বিনে বসতি করয় সর্বজন ।। (ঐ পৃঃ ৫৭)

৩. নগর ভ্রমর কন্যা বৎসরে দুবার ।
সকলের মনোবাঞ্ছা কন্যা দেখিবার ।। (ঐ পৃঃ ৫৯)

৪. ক্ষনে আলাপয় ক্ষনে বিলাপে আপনে ।। (ঐ পৃঃ ৬১)

৫. কথঞ্চিৎ দুঃখে ক্লেসে নিশি হৈল শেষ ।
প্রবোধ না পায় বালা বিলাপে বিশেষ ।। (ঐ পৃঃ)

---

৫. দৌলৎ কাজী, সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী, ময়হারুল ইসলাম, ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত, (ঢাকাঃ ১৯৭৩), দ্বিতীয় সংস্করণ ।

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ শ্লেষের উদাহরণঃ-

১. মানের মকার আর ভাগ্যের গকার ।
শুভযোগে নক্ষত্রের আমিল নকার ।। (পদ্মাবতী, পৃঃ ২৯)

২. মোহাম্মদ কবীরে কহে মালত মাধুরী ।
গুন্থিয়া মালতী পুষ্প দিঅ কেশজড়ি ।। (মধুমালতী, পৃঃ ২০)

যমকের ব্যবহার :—

১. খঞ্জন -গঞ্জনন্ত্রে অঞ্জন রঞ্জিত ।। (পদ্মাবতী, পৃঃ ১১২)

২. অলঙ্কিত কায়া যেবা ছিল সিদ্ধজ্ঞান ।
সকল হরিল তিলে রূপ জ্ঞান ধ্যান ।। (ঐ পৃঃ ১৮৪)

৩. বিকশিত কুসুম পীরিতি উপবন ।
চৌদিকে আমোদ কৈল বাদক পবন ।। (লায়লী মজনু, পৃঃ ৩২)

৪. চিনিতে নারিলুং মুঞি কোন রূপ রঙ্গে ।
লখিতে নারিলুং অঙ্গ রঙ্গের তরঙ্গে ।। (ঐ পৃঃ ৫৩)

৫. রঙ্গা উজিয়াল ভাল নাহৈছে প্রকাশ ।।
অদ্যাপিহো জম্মুপতি রহিছে আকাশ ।। (মধুমালতী, পৃঃ ১৩)

৬. মোহাম্মদ কবীরে কহে কুমার আলাপ ।
মনোহর ভাবে মধুমালত বিলাপ ।। (ঐ পৃঃ ১৩)

৭. তে কারনে নাগগণ শিরে ছত্রবৎ ।
রহিল সু-ধর্ম কীর্তি পৃথিবী যাবৎ ।। (সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পৃঃ ৫৩)

Dhaka University Institutional Repository

খ অর্থালংকার

অর্থালংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও রোমান্স কাব্যের কবিরা বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মধুমালতী কাব্যে উপমা- উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের উদাহরণ :-

১. কাঞ্চন কটোরা কুচ অধিক সুচারু। (মধুমালতী, পৃঃ ৮)

২. কামাসন [illegible]স্তম্ভ যেন দুই উরু ॥ (উৎপ্রেক্ষা) (ঐ পৃঃ ৮)

৩. তোম্মার প্রেমের বড়শী ফুটিছে অন্তরে ॥ (রূপক) (ঐ পৃঃ ১৯)

৪. সুজনের প্রেম যেন জলদ দামিনী ॥ (উৎপ্রেক্ষা) (ঐ পৃঃ ১২)

৫. চতুর্দিকেমুণ্ডণ ধাইছে আউদল কেশ ॥ (ঐ পৃঃ ১২)

৬. সুকন্যা কাষ্ঠেতে বৈসে রসের ভান্ডার। (ঐ পৃঃ ৩৭)

লায়লীমজনু কাব্যে উপমা- উৎপ্রেক্ষা ও রূপকের দৃষ্টান্ত :-

১. ডুবা ইলা কুল- নৌকা কলংক-সাগরে। (রূপক) (লায়লী-মজনু, পৃঃ ৫৯)

২. প্রেমধন অতুল রতন পরিপাটি। (ঐ পৃঃ ৫৩)

৩. অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু মাঝ। (ঐ পৃঃ)

৪. মরমে ডংশিল মোর বিরহ- ভুজঙ্গ। (রূপক) (ঐ পৃঃ ৮১)

৫. বিষম পীরিতি- ফান্দে বন্দী হইল মন। (রূপক) (ঐ পৃঃ ৮৬)

৬. দারুন প্রেমের বান পশিল অন্তরে। (উপমা) (ঐ পৃঃ ৮৬)

সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী কাব্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং রূপকের দৃষ্টান্ত :-

১. কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ ॥ (উৎপ্রেক্ষা) (সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী পৃঃ ৫৩)

২. সুরপুর সম রূপ মোহরা নগরী। (উপমা) (ঐ পৃঃ ৫৯)

Dhaka University Institutional Repository

পদ্মাবতী কাব্যে উপমা, রূপক, ও উৎপ্রেক্ষার দৃষ্টান্ত :-

১. ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইল অতনু। (রূপক) (পদ্মাবতী, পৃঃ ১১১)
লজ্জা পাই তেজিল কুসুমশর ধনু ॥

২. শ্রবণযুগল চারু জিনি সিন্ধু-সুতা। (উপমা)
অগমন পাতিয়ায় ঝলকে মুকুতা ॥ (ঐ পৃঃ ১১৬)

৩. গজেন্দ্র-গমন জিনি গতি অতি ভাল। (উপমা) (ঐ পৃঃ ১২৬)
খঞ্জন গঞ্জন জিনি লজ্জিত মরাল ॥

৪. সুন্দর মগদ পাগ মস্তকে শোভিত। (উৎপ্রেক্ষা) (ঐ পৃঃ ২৫)
নব ঘন জিনি যেন চন্দ্রিমা উদিত ॥

৫. অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে। (উৎপ্রেক্ষা) (ঐ পৃঃ ১১২)
সমদৃষ্টি চাইতে নারি বর্ণিব কেমতে ॥

সমগ্র রোমান্স কাব্য সাহিত্যে অতিশয়োক্তি অলংকারের উদাহরণ দেয়া হলো :-

১. তুমি মোর প্রানেশ্বরী অতি শুধাশএ।
(মধুমালতী, পৃঃ ১০)
অগ্নি পরে থুই তোহ্মা ঘুরিমু সদাত্র ॥

২. দোলন বেলন নাহি নীরস নয়ন।
(লায়লী-মজনু, পৃঃ ৫৭)
উরু ভেদি তরু হইল নাহিক চেতন ॥

৩. নানা বর্ণ উদ্যানে পুর্ণিত ফল ফুল। (উপমা)
কুরূপ দুর্গন্ধ তথা সুপু সমতুল ॥ (পদ্মাবতী, পৃঃ ১০৬)

৪. মহা দর্পী কাম, রাজা ত্রিলোক পূজিত। (রূপক)
(সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানী, পৃঃ ১৩৪)
যার বানে অষ্ট দিক কামে বিমোহিত ॥

Dhaka University Institutional Repository

অর্থালংকার এর মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগ রোমান্টিক কবিরা ব্যবহার করেছেন বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে । এ ছাড়াও কবি প্রসিদ্ধি, উল্লিখন, অলংকার এবং প্রবাদের ব্যবহার ও রয়েছে রোমান্স কাব্য গুলিতে । সব কবিই নিজের প্রতিভা অনুযায়ী নিজস্ব বাচনভঙ্গী ও অলংকার নির্মানে কলা-কৌশল দেখাতে পেরেছেন ।

মধ্যযুগের ব্যাপক পরিসর জুড়ে রয়েছে মঙ্গল কাব্য । মঙ্গলকাব্য ধারার প্রসিদ্ধ কবিরা হলেন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, ঘনরাম চক্রবর্তী, কেতকাদাস- ক্ষেমানন্দ প্রমুখ ।

ভারতচন্দ্র অলংকার ব্যবহার করেছেন চাতুর্যের সাথে। তাঁর কাব্যের ভাষাই আলংকারিক । অথচ ঐ সব অলংকারকে তিনি এমন প্রাঞ্জলোকপূর্ণ করেছেন যে, গোটা ব্যাপারটিই স্বভাবোক্তি হয়ে উঠেছে । অলংকার ব্যবহারে ভারতচন্দ্র সুকৌশলী শিল্পী । তাঁর কাব্যে অর্থালংকার অপেক্ষা শব্দালংকারেরই প্রাধান্য । কবি কাব্যের অনেক মালা গেঁথেছেন অনুপ্রাস দিয়ে ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে [৬] শব্দালংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমেই বিবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত :-

১. অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা ।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা ।। (অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ১৫)

২. শুন শুন নিবেদন সভাজন সব ।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব ।। (ঐ পৃঃ ১৫)

৩. চক্র করি চক্রপানি চক্রেতে কাটিয়া । (ঐ পৃঃ ৮০)

৪. অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তব পড়িল যেখানে । (ঐ পৃঃ ৮০)

৫. পঙ্কজ দেহে পঙ্কজমুখ হৈলা পঙ্কজান্ন ।। (ঐ পৃঃ ১৯)

---

৬. ভারতচন্দ্র - গ্রন্থাবলী, সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, প্রথম খন্ড, (কলকাতা : ১৩৪৯) ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুপ্রাসের আরো দৃষ্টান্ত :—

৬. বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা
এক হস্তে কলমান আর হস্তে কুলা ।। (অন্নদামঙ্গল , পৃঃ ২৯)

৭. তিন জন পরস্পর লাগিলা জপিতে ।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে ।। (ঐ পৃঃ ৩২)

৮. শ্বশুর তোমার দক্ষ সমৃদ্ধ গৌরব ।
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব ।। (ঐ পৃঃ ৪২)

৯. ক্ষিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে ।। (ঐ পৃঃ ৮৮)

১০. কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন ।। (ঐ পৃঃ ৯৫)

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে [৭] শব্দালংকারের ব্যবহার :-

শব্দালংকারের ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গলেও অনুপ্রাসের প্রাধান্য রয়েছে । তিনিও তাঁর কবিতার চরণে-চরণে বিচিত্র অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন । তাঁর কবিতায় বিবিধ অনুপ্রাসের উদাহরণ :-

১. ঘন কেরং আল পড়ে জ্বলে বাজে ঘাট । (চন্ডীমঙ্গল)
নিমেষেক জায় সাধু জোজনেক বাট ।

২. চক্রনাদ চক্রিকা ছাড়েন চক্ররণে । (ঐ পৃঃ ৪১৫)

৩. চামর চন্দন শঙ্খ দিলা গুরুতর ।। (চন্ডীমঙ্গল)

---

৭. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী , চন্ডীমঙ্গল, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত ,
(কলকাতা : ১৯৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যে শব্দালংকার ব্যবহার :-

ঘনরাম চক্রবর্তী বিদগ্ধ কবি, তাঁর বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ রয়েছে অলঙ্করণে। তাঁর ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং উন্নত রুচির পরিচায়ক। যথাযথ অনুপ্রাস প্রয়োগ তাঁর রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করেছে।

বিবিধ অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত :

১. সংসার সম্পদ সুখ সকলি বিফল।
শুনি কর্ণসেন বলে সব কর্মফল ॥ (শ্রীধর্মমঙ্গল, পৃঃ ৬৮)

২. নির্গুন নিদান নিত্য নিরাকার ব্রহ্ম ॥ (ঐ পৃঃ ৬৮)

৩. গাঁথিয়া জুতার মালা দিয়াছে গলায়।
মতির মাফিক গতি লিখ্যাছে ফলায় ॥ (ঐ পৃঃ ১৭৫)

৪. গদগদ গরুড় গোবিন্দ গুন গায়।
গুড়ি গুড়ি গরুড় গমনে গুড়ি যায় ॥ (ঐ পৃঃ ১৭৫)

৫. শত শত শশক শার্দ্দুল শ্যাল শিবা।
চিত্র কোটি পতঙ্গ কতেক কব কিবা ॥ (ঐ পৃঃ ১৭৫)

মঙ্গল কাব্য শাখায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাব্য 'মনসা মঙ্গল' কাব্য। এ কাব্যে কিভাবে অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে তা আলোচনা করা যাক। প্রাচীন কবিদের রচনা পাঠে বোঝা যায় বর্ণনীয় বিষয়ের চেয়ে বরং ছন্দ এবং অলংকার প্রদর্শনই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। কবি অলংকার প্রয়োগের জন্য আলাদাভাবে প্রয়াসী হননি।

---

৮. ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্রীধর্মমঙ্গল, শ্রীপিযুষকান্তি মহাপাত্র, কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৬২)।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর কাব্যে অলংকার স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে । কবি অনেক ক্ষেত্রে ভাবানুযায়ী শব্দ যোজনা করেছেন । কবির কাব্যে উভয় শ্রেণীর অলংকার প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেলেও শব্দালংকারেই কবি বেশী পারদর্শী ছিলেন বলে মনে হয়।

কবির মনসামঙ্গল কাব্য [১] থেকে বিবিধ অনুপ্রাসের উদাহরণ :-

১. তুমি রবি শশী নিশি দিশি পরকাশ ।(মনসামঙ্গল , পৃঃ ১৬৪) ।

২. বিনু পাত অচিরাত করি হাত ভূতনাথ । (ঐ পৃঃ ৭০)

৩. দুর্জ্জয় দক্ষিনে চলে দুর্জ্জয় প্রতাপ । (ঐ পৃঃ ৫৫)

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে যমকের দৃষ্টান্ত :

১. আস লক্ষ্মী অন্নদেহ ডাকেন শঙ্কর ।
ভারত কহিতেছে লক্ষ্মী হইলো ফাঁফর ॥ (অন্নদামঙ্গল ,পৃঃ ৯৮)

২. দুই গন্ডে গন্ডগোল অলি মাছিতায় । (ঐ পৃঃ)

৩. দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন ।
ধর্মাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন ॥ (ঐ পৃঃ ২৯)

৪. মধুমাসে মরুত মলয়া মন্দ মন্দ ।
মালতীয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ (চন্ডীমঙ্গল, পৃঃ ১৫৫)

৫. মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জয় শঙ্খ ।
খমট ঠমক বাজে শামি জয় শঙ্খ ॥ (ঐ পৃঃ ৪১)

৬. বিশ্বকর্ম্ম পান যদি সাদরের পান । (মনসামঙ্গল ,পৃঃ ৪৪)

৭. মহামায়া মহিমা সুনেন মহামতি ॥ (শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ৩৭)

---

১. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ , মনসামঙ্গল, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ,প্রথম খন্ড (কলকাতাঃ ১৯৪৩)

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গল কাব্য গুলিতে শ্লেষ অলংকারের দৃষ্টান্ত:

১. অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে ।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে ॥ (অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ৭৬)

২. "ভাল চাস গৌরবে গৌরবে চলে যা ॥ (শ্রীধর্মমঙ্গল, পৃঃ ২১)

৩. গৌড় পাটনে হয় পিঞ্জর নির্মিত । (চন্ডী মঙ্গল, পৃঃ ৫৭)

ভারতচন্দ্র শ্লেষ বা শব্দ ব্যবহারে নিপুনতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন অন্নদার আত্ম পরিচয় শ্লেষ অলংকারের চমৎকার দৃষ্টান্ত রয়েছে :-

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুন ।
কোন গুন নাহি তার কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥ (অন্নদামঙ্গল , পৃঃ ২১৫)

খ. অর্থালংকার :-

অর্থালংকার ব্যবহারে মঙ্গল কাব্যের কবিরা দক্ষতা দেখিয়েছেন । উপমা, ব্যবহারে ভারতচন্দ্র রায় খুব পারদর্শিতা দেখিয়েছেন , তার কাব্যে প্রচুর উপমা অলংকারের দক্ষ প্রয়োগ রয়েছে । একই ভাবে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও তার কাব্যে উমপা, উৎপ্রেক্ষা , রূপক , ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি ব্যাজস্তুতি ইত্যাদি জাতীয় অলংকারের ব্যবহার করেছেন। কবি মুকুন্দরাম উপমায় যে উপমান গুলি ব্যবহার করেছেন তা দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় —

ক. সংস্কৃতানুসারী ও প্রথানুগ, খ. লোকায়ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা জাত ।

এছাড়াও ঘনরাম চক্রবর্তী ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁরাও অর্থালংকার প্রয়োগে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং নানা ধরনের অর্থালংকার ব্যবহার করেছেন তাঁদের কাব্যে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে উপমা, রূপক এবং উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার দেখানো যাক :-

উপমা:

১. বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির ।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর ।। (অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ১১৭)

২. তোমার ক্রোধের কাল প্রলয় সমান । (চন্ডীমঙ্গল, পৃঃ ৩৮৯)

৩. ছৈ ঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া ছাল ।
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকাতাল ।। (ঐ পৃঃ ২২১)

৪. দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ শশী ।
আনন্দে বিহ্বল দেখি মঙ্করা রূপসী ।। (শ্রীধর্মমঙ্গল, পৃঃ ২৪)

৫. বিজুরী জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ । (মনসামঙ্গল, পৃঃ ৬৫)

উৎপেক্ষা:

১. পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রের দেখিলে ।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে ।। (অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ১১)

২. শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ।। (ঐ পৃঃ ৮৮)

৩. লহ লহ করে কত হস্তিকের শুন্ড ।
পিপিড়ার গন যেন পাইকের মুন্ড ।। (চন্ডীমঙ্গল, পৃঃ ৪০৭)

৪. সহিত যুগল ভুরু জিনি কাম ধনু । (শ্রীধর্মমঙ্গল, পৃঃ ১৫০)

৫. মধুর মধুর কথা কহেন হরিষে ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে ।। (মনসামঙ্গল, পৃঃ ৮৯)

Dhaka University Institutional Repository

ভারতচন্দ্রের কাব্যে দক্ষের শিবনিন্দা স্থলে যে ব্যাজস্তুতি অলংকারের দৃষ্টান্ত আছে বাংলা কাব্যে এরূপ নির্দোষ ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত সুলভ নয় —

"সভাজন শুন জামাতার গুন,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুন নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুন দড়॥" (অন্নদামঙ্গল, পৃঃ ৩৮)

ব্যতিরেকঃ

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥ (ঐ পৃঃ ১৯)

অপ্রস্তুত প্রশংসাঃ

"সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥" (ঐ পৃঃ)

ভারত চন্দ্রের কবি কর্মে সৃষ্ট সমস্ত চরিত্র অলংকার ধর্মী আর্টের বিশুদ্ধ নির্দশন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি ব্যবহার ছাড়াও অধিকারন্যূবৈশিষ্ট্য রূপক, অতিশয়োক্তি, দৃষ্টান্ত, নিদর্শনা, অর্থাপত্তি ও কাব্যলিংঙ্গের প্রয়োগ আছে, বিভিন্ন ধরনের অর্থালংকারের মধ্যে নিদর্শনা ও উপমার প্রয়োগেই চমৎকারিত্ব লক্ষিত হয় —

অধিকারন্যূ বৈশিষ্ট্য রূপকঃ

মুখ অকলঙ্ক শশী বচন পীযুষরাশি
জলদ নিন্দিয়া বেশ ভরে। (মনসামঙ্গল পৃঃ ২৩৮)

Dhaka University Institutional Repository

অতিশয়োক্তি :

১. পৃথিবী মন্ডল করে টল্‌বল্‌
বাসুকি কাঁপয়ে ডরে । (মনসামঙ্গল, পৃঃ ৯৫)

২. ভাঙ্গি পূর্ণ ইন্দু রচে বিন্দু বিন্দু
কনক কুসুম ফুলে । (ঐ পৃঃ ৩২৬)

দৃষ্টান্ত :

"ছয়কুড়ি ছয় শিষ্য যদি মরে তার,
ধনু নুরি একাহৈলে কি করিবে আর ॥
কাটিলে বৃক্ষের ডাল মূল যদি রস ।
মঞ্জরিতে পুনরপি বহুদিন হয় ॥" (ঐ পৃঃ ১৬১)

নিদর্শনা :

প্রেমের আশরা দিয়া পাথরে বান্ধিলে হিয়া
ভরাডুবি করিলে শুখানে । (ঐ পৃঃ ৩৩)

অর্থাপত্তি :

নানা চিত্র মালাকার করে নানা ফুলে ।
মুনিগন মো হ যায় তার গন্ধ মালে ॥ (ঐ পৃঃ ৭২)

মধ্যযুগের প্রায় সমস্ত সাহিত্য কর্মই নানা অলংকারে সজ্জিত ।

প্রাগুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি মধ্যযুগের কবিরা সবাই অলংকারের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন । আবেগের প্রাবল্য তাঁদের সৃষ্টিকে যতোই প্লাবিত করুক না কেন, কাব্য

Dhaka University Institutional Repository

বৈষ্ণব কবিগন তাঁদের পদ সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুসরন করে প্রাচীন অলংকারই বেশী প্রয়োগ করেছেন । চন্ডীদাস এবং তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ রীতি অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরা পল্লী জীবন থেকেই অলংকারের উপাদান খুজেঁছেন । বিদ্যাপতি ও তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস সংস্কৃত অলংকরণ রীতি গ্রহণ করেছেন তাঁদের রচনায়, বৈষ্ণব কবিরা শব্দালংকার ও অর্থালংকার উভয় শ্রেণীর অলংকারই ব্যবহার করেছেন ।

রোমান্স কাব্যে অলংকারের অঢেল ব্যবহার রয়েছে ,তবে এ রকম কাহিনী কাব্যগুলিতে উপমা এবং রূপক অলংকারেরই প্রাধান্য বেশী । রোমান্টিক কবিদের প্রায় সবার কাব্যেই রূপ বর্ণনা অংশে গতানুগতিক উপমা ব্যবহারের প্রবনতা লক্ষ্য করাযায় । এই জাতীয় কাহিনী কাব্যে শব্দালংকারের চেয়ে অর্থালংকারের প্রয়োগ বেশী রয়েছে । উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা আমাদের চারপাশের জগৎ থেকেই অলংকারের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন । শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস রোমান্স কাহিনীকারদের কাছে খুব প্রিয় বিষয় ছিল। তাঁদের কাব্যে এ অলংকারের প্রচুর প্রয়োগ দেখে তাই মনে হয় ।

মধ্যযুগের সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ তাঁদের রচনায় প্রচুর অলংকার ব্যবহার করেছেন । তাঁদের প্রত্যেকের রচনাতেই অর্থালংকারের প্রাধান্য , তবে বিবিধ অনুপ্রাস ছিল তাঁদের প্রিয় বিষয় । তাঁদের কবিতার চরণে-চরণে অনুপ্রাসের দরু সমাবেশ ঘটিয়েছেন ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষাই আলংকারিক । তিনি ছিলেন তৎকালীন নাগরিক কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যে অলংকরনের উপকরণ হিসেবে নাগরিক শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে । অলংকার আলোচনায় কবির একটি বিশেষ প্রবনতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । বিরোধমূলক অলংকারের প্রতি তাঁর খুব আসক্তি ছিল । কিন্তু কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন গ্রামীন কবি , তাই তাঁর কাব্যে গ্রামীন অভিজ্ঞতা এবং মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি তাঁর উপমা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ এবং বহু ব্যবহৃত ভান্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন । কবির ভাষা-রীতি উপমাশ্রয়ী । তাই তাঁর উপমায় বন-জঙ্গল, জলকাদা ও গ্রামীন শব্দ এসেছে উপকরণ হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

ঘনরাম চক্রবর্তী ছিলেন একজন বিদগ্ধ কবি। তাঁর কাব্যে ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পূর্বসূচনা দেখতে পাওয়া যায়। ঘনরাম চক্রবর্তীর ভাষা অত্যন্ত মার্জিত ও রুচিসম্মত। যথাযথ অনুপ্রাস প্রয়োগ তাঁর রচনাকে অনেক সময় শক্তি মধুর করেছে। তাঁর কাব্যের যে কোন জায়গা থেকেই সে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অলংকার সৃজনে আলাদাভাবে প্রয়াসী হননি। তাঁর কাব্যে অলংকার এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। দুরকম অলংকারই ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। অর্থালংকারেই তাঁর প্রবণতা বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

"তৃতীয় অধ্যায়"

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের বিভিন্ন কাব্যে অলংকারের ব্যবহার[১]

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে শব্দালংকার ও অর্থালংকার দুই ধরনের অলংকারই ব্যবহার করেছেন। তাঁর দুটি কাব্য থেকে বিভিন্ন ধরনের অলংকারের উদাহরণ দেয়া হলো-

ক. শব্দালংকার :

চার ধরনের শব্দালংকারের মধ্যে কবির ঝোঁক ছিল প্রধানত অনুপ্রাসের প্রতি। সব রকমের অনুপ্রাসের দক্ষ ব্যবহার তিনি করেছেন।

ক.১. অনুপ্রাস : "একই ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে।"[২]

'সত্যপীরের কথা' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক-

বনিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি। (পৃঃ ২৩)

পংক্তিতে 'ব' ধ্বনি চারবার, 'প' ধ্বনি দু'বার এবং 'ন' 'ণ' ধ্বনি তিনবার করে বিন্যস্ত হয়ে চমৎকার অনুপ্রাস সৃষ্টি করে শ্রুতিমাধুর্যের জন্ম দিয়েছে।

'শিব সঙ্কীর্তন' কাব্য থেকে অনুপ্রাস-এর দৃষ্টান্ত -

অতল বিতল সুতল তলে। (পৃঃ ২১)

পংক্তিতে 'ত' এবং 'ল' ধ্বনি চারবার বিন্যস্ত হয়ে ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করেছে এবং চমৎকার অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছে।

---

১. বিভিন্ন অলংকারের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে জীবেন্দ্র সিংহ রায়-এর 'বাংলা অলঙ্কার' (কলকাতাঃ ১৯৮৫) ৬ষ্ঠ সংস্করণ ,, এবং নরেন বিশ্বাস-এর 'অলংকার অন্বেষা' (ঢাকাঃ ১৯৭ থেকে। উদাহরণের জন্য শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'সত্যপীরের কথা' (কলকাতাঃ ১৩৩ এবং শ্রীযোগীলাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত 'শিব সঙ্কীর্তন' (কলকাতাঃ ১৯৫৭), কাব্য দুটি ব্যবহার করা হয়েছে।

২. জীবেন্দ্র সিংহ রায় , 'বাংলা অলঙ্কার,' পৃঃ ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

এবার কবির কাব্যগুলিতে অনুপ্রাস ব্যবহারের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবো : প্রথমেই

ক.১.১ অন্ত্যানুপ্রাস:

'কবিতার এক চরণের শেষে যে শব্দধ্বনি থাকে অন্য চরণের শেষে তার পুনরাবৃত্তি হলে অন্ত্যানুপ্রাস হয়।[৩] দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক -

১. প্রবল প্রতাপ প্রভু পাপ- তাপহারী।
যেরূপে জাহির পীর নিবেদন করি ।। (সত্যপীরের কথা পৃঃ ৭)

এখানে প্রথম চরণের শেষে 'ঈ' স্বর ধ্বনিসহ 'র' ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, দ্বিতীয় চরণের শেষ শব্দধ্বনি 'ই' স্বর ধ্বনিসহ 'র' ব্যঞ্জন ধ্বনির সাথে অনুপ্রাসিত হয়েছে । দেখা যাচ্ছে প্রথম চরণের শেষের শব্দ ধ্বনির সাথে দ্বিতীয় চরণের শেষের শব্দ ধ্বনির অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

২. মুখে জল দিয়া কেহ করাইল চেতন ।
কহে রামেশ্বর কন্যা করহ রোদন ।। (ঐ পৃঃ ৪২)

এখানেও প্রথম চরণের শেষে 'অ' স্বর ধ্বনিসহ 'ন' ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে , দ্বিতীয় চরণের শেষে তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে । সুতরাং এটি অন্ত্যানুপ্রাসের দৃষ্টান্ত ।

৩. দুয়ারে দুন্দুভি বাজে কুকুরে বিষান ।
আকাশে আল্লাস উঠে পীরের নিশান ।। (সত্য পীরের কথা, পৃঃ২৭)

এই দৃষ্টান্তে প্রথম চরণে 'আ' স্বর ধ্বনিসহ 'ণ' ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে , এবং শেষ চরণের 'আ' স্বর ধ্বনিসহ 'ণ' ব্যঞ্জন ধ্বনির অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ।

---

৩. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃঃ ৪৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. দক্ষ পক্ষ বিপক্ষ দেখিয়া দড়বড় ।
দুই দলে সমর লাগিল কড়কড় ।। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৪০)

প্রথম চরণের শেষে 'অ' স্বর ধ্বনি 'ড়' ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে, দ্বিতীয় চরণের শেষে তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে । এবং অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

৫. ত্রিলোচন ত্রিকালজ্ঞ তপস্বীর বেশে ।
কৃপা হয়্যা কন কথা কুমারীর পাশে ।। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৬৫)

উদ্ধৃতিটিতে প্রথম চরণের শেষে যে শব্দ ধ্বনি আছে, দ্বিতীয় চরণের শেষে তার অবিকল পুনরাবৃত্তি হয়ে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ।

অন্ত্যানুপ্রাসের আরো উদাহরণ ঃ

৬. প্রেয়সীকে প্রশংসিয়া কহিলেন কথা ।
কেশবের সেসব এ সব সব কথা ।। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২৩)

৭. তোর হরি তোরে বলি পীর হৈলা ঘাটে ।
মোরা দেখি কেরামত তবে জানি বটে ।। (ঐ পৃঃ ২৫)

৮. সংসার-সাগর মধ্যে সবে সুখে আছে ।
আমরা অবোধ মতি আছি পদ কাছে ।। (ঐ পৃঃ ২৯)

৯. সন্মান করলে সত্যপীরে সিন্নি মেনে ।
পাসরে পেয়েছে দুঃখ সদানন্দ বেনে ।। (ঐ পৃঃ ৩০)

১০. কাহে রে কুটুন গির্দ্দ মৌত লগা তেরা ।
ছোড় সদানন্দ নাম সেবককো মেরা ।। (ঐ পৃঃ ৩৫)

১১. সদা দিল প্রতিফল দেখে গিয়া সতী ।
বাপ বন্ধু কান্দে ঘাটে দুবে মৈল পতি ।। (ঐ পৃঃ ৪২)

Dhaka University Institutional Repository

১২. থর থর কাঁপে দক্ষ রক্ত রক্ত কয়।
গরুড় দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভয় ।। (শিব-সঙ্কীর্তন পৃঃ ৪৩)

১৩. দেখে নাই চক্ষে কিছু শুনে নাই কানে।
বলে নাই বাক্য কিছু সতী সতী বিণে ।। (ঐ পৃঃ ৪৫)

১৪. যারে যে বলেন তারা করে সেই কর্ম্ম ।
একদিন দেখাইল সংসারের ধর্ম্ম ।। (ঐ পৃঃ ৪৯)

১৫. পুঁটি মৎস্য ভাজা দিল তাল খোলা কুচি।
সফরীতে সবার সুন্দর হবে রুচি ।। (ঐ পৃঃ ৫১)

১৬. অচলের কথা কভু চলিবার নয়।
পূর্ব্বের সবিতা যদি পশ্চিমে উদয় ।। (ঐ পৃঃ ৫৫)

১৭. আম্রশাখা ভাঙ্গিয়া শিয়রে বৈসে সতী।
ইন্দ্র আদি দেবতা আমার কর গতি ।। (ঐ পৃঃ ৬১)

১৮. মালা মনয়জ দিয়া মুখে দেই মিঠা।
দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু ক্ষীর খন্ড পিঠা ।। (ঐ পৃঃ ৬১)

১৯. সুহৃদের শুভ চিন্তা সবাকার বটে ।
অবিবার্য্য কর্ম্মভোগ অকস্মাৎ ঘটে ।। (ঐ পৃঃ ১৬৭)

২০. বা মাঈ স্পন্দন করে গুরুভুজ বক।
জানিল যাদব আলা শিব হৈল পক্ক ।। (ঐ পৃঃ ১৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

২১. তুমি যদি তারে নিয়া করিবে গমন।
মোদের কি হবে মোরা করিব কেমন ॥ (শিব-সঙ্কীর্তন পৃঃ ১২৭)

২২. অকিঞ্চনে আপনে চরণে রাখ সই ।
আমার মনের কথা এতক্ষণে কই ॥ (ঐ পৃঃ ৩১১)

ক.১.২ বৃত্ত্যানুপ্রাসঃ

"যদি একটি ব্যঞ্জন ধ্বনি একাধিকবার ধ্বনিত হয় কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ যথার্থ ক্রমানুসারে সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে বহুবার ধ্বনিত হয় তবে বৃত্ত্যানুপ্রাস হয় ।[৪]

দৃষ্টান্ত দেয়া যাক-

১. বন্দো বহ্নি বিপ্র বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৫)

এখানে ক ব্যঞ্জন ধ্বনি সাতবার এবং 'ন' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার আবৃত্ত করা হয়েছে , একই ধ্বনির অনেকবার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উদ্ধৃতিতে বৃত্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

২. কলিতে কলির কথা কাঁপে কলেবর । (সত্য পীরের কথা, পৃঃ ৬)

এখানে 'ক' ব্যঞ্জন ধ্বনি পাঁচবার , 'ল' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার এবং 'র' ধ্বনির দুইবার আবৃত্তি করা হয়েছে । সুতরাং উদ্ধৃতিটি বৃত্ত্যানুপ্রাস হয়েছে ।

৩. কেবল করুণাময় কলি কলাতরু ॥ (শিব-সঙ্কীর্তণ, পৃঃ ৯)

গ পংক্তিতে 'ক' ব্যঞ্জন ধ্বনি চার বার 'ল' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার এবং 'র' ধ্বনি দুইবার আবৃত্ত হয়েছে এবং বৃত্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

৪. গোপ গোপী গোপাল গোকুল গোবর্দ্ধন । (ঐ, পৃঃ ২৩)

এ পংক্তিতে 'গ' ব্যঞ্জনধ্বনি পাঁচবার 'প' ব্যঞ্জনধ্বনি তিনবার এবং 'ন' ব্যঞ্জন ধ্বনি দুইবার ধ্বনিত হয়ে ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছে এবং বৃত্ত্যানুপ্রাস অলংকার সৃষ্টি করেছে ।

---

৪. জীবেন্দ্র সিংহ রায় , পৃঃ ১৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

বৃত্ত্যনুপ্রাসের আরো দৃষ্টান্ত :

৫. সুরা সুনা সুবর্ণবনিক্ সুর্ণকারে । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ১৫)

৬. বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝিয়া বলেবচ্চা । (ঐ , পৃঃ ১৬)

৭. বণিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি । (ঐ পৃঃ ২৩)

৮. পরীক্ষিত-পতনে প্রবল হৈল কলি ॥ (ঐ পৃঃ ১৫)

৯. পাবক ব্যাপক বিশ্বদাহকের লেখা । (ঐ পৃঃ ২৫)

১০. দাস দুঃখ দেখি দামোদরে হৈল দয়া । (ঐ পৃঃ ৯)

১১. কংশ কেশি মথনে কেশব মোর নাম । (ঐ পৃঃ ১৪)

১২. পূজিলে পীরের পদ নিরাপদ নয় ॥ (ঐ পৃঃ ২০)

১৩. চক্রপাণি চরণে চিত্তের রহে যোগ ॥ (ঐ পৃঃ ২০)

১৪. জিজ্ঞাসিতে জায়া জনকের কথা কয় ॥ (ঐ পৃঃ ২৩)

১৫. বামভাগে বনিতা বিরাজে অপরূপ । (ঐ পৃঃ ২৮)

১৬. বিঘ্ন চূর্ণ গেল তূর্ণ হৈলপূর্ণ কাম ॥ (ঐ পৃঃ ২৮)

১৭. প্রকারের পীরের পদ পরম কারণ । (ঐ , পৃঃ ২৩)

১৮. সংক্ষেপে সে সব কথা কহে রামেশ্বর । (ঐ, পৃঃ ৩০)

১৯. বিরহে বিদরে বুক স্মর শরজাল । (ঐ পৃঃ ৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

২০. দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরের পুর । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৭)

২১. জঠরের জ্বলনে যখন জীউ যায় । (ঐ পৃঃ ৭)

২২. পৃথিবীতে পূজার প্রচার তবে হয় ।। (ঐ পৃঃ ১৭)

২৩. নারদের নিকটে নিশ্বাস ছাড়্যা উঠে ।। (শিব -সঙ্কীর্ত্তন, পৃঃ ২৫)

২৪. কাট কাট কর্য়া কোটি কোটি ছাড়ে বাণ ।। (ঐ পৃঃ ৪১)

২৫. পুলকিত পর্ব্বত প্লাবিত প্রেমজলে ।। (ঐ পৃঃ ৫৫)

২৬. প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদলোভে । (ঐ পৃঃ ৬১)

২৭. রহিবেন রতিনাথ বাঘরের পেটে ।। (ঐ পৃঃ ৬৩)

২৮. শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর । (ঐ পৃঃ ৬৭)

২৯. মনোহর মহামুনি মহেশেত কয় ।। (ঐ পৃঃ ৭৩)

৩০. চেতরাজ চলিলেন চড়ি চিত্ররথে ।। (ঐ পৃষ্ঠ ৭৫)

৩১. হেনকালে হৈমবতী হরে কন এই । (ঐ পৃঃ ৭৯)

৩২. ভদ্রকালী ভবানী ভৈরবী ভগবতী । (ঐ পৃঃ ৭৮)
ভানুমতি ভাগ্যবতী ভাগীরথী রতি ।।

৩৩. মেনকার মনস্তাপ মন দিয়া শুন ।। (ঐ পৃঃ ৮২)

৩৪. হায় হায় হায় হেদে হাভাতিয়ার ঝি । (ঐ পৃঃ ৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র । (শিব-সঙ্কীর্ত্তন, পৃঃ ৯৭)

৩৬. কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত করা্যা বুকে ॥ (ঐ পৃঃ ১০১)

৩৭. ডাকিনী ডিম্বের ঘরে ডুবাইল দেশ । (ঐ পৃঃ ১১১)

৩৮. বুঝিলেন বিলক্ষণ বিলক্ষণ বোল । (ঐ পৃঃ ১২৩)

৩৯. মহাবল বাজে বান বানে বান তাড়ে ॥ (ঐ পৃঃ ১৯৫)

৪০. ব্রতের বিধান বলি শুন সাবধানে । (ঐ পৃঃ ২০০)

৪১. দেবদেব দুর্গার দেখিয়া দক্ষ কর । (ঐ পৃঃ ৩২৩) ।

ক.১.৩ ছেকানুপ্রাস ঃ

"একই ধ্বনিগুচ্ছ যদি একই ক্রমে সংযুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে মাত্র দুইবার ধ্বনিত হয় তবে ছেকানুপ্রাস হয় ।"[৫]

ছেকানুপ্রাস শব্দটি সংস্কৃত অলঙ্কারের পরিভাষা রূপে গৃহীত । এখানে 'ছেক' মানে বিদ্বান বা বিদগ্ধজন এবং তাঁদের প্রজ্ঞাপ্রসূন পরিমিত ব্যবহারের জন্য এর নাম ছেকানুপ্রাস । এখানে মাত্র দুই বা তার অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় মাত্র দু'বার ধ্বনিত হয়ে ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করে ।

দৃষ্টান্ত দেয়া হলো -

১. খেতে চারি চানু নাক্রি চালে নাক্রি খড় । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৭) ৮৭

এখানে 'নাক্রি' ধ্বনিগুচ্ছ একই ক্রমে মাত্র দুইবার ধ্বনিত হয়েছে । সুতরাং এখানে ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃষ্ঠা: ২৯ ,

Dhaka University Institutional Repository

২. ধৈরজ না ধরে দ্বিজ ধৈরজ না ধরে । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৯)

পংক্তিতে 'ধৈরজ' শব্দটি একই ক্রমে বিযুক্ত ভাবে মাত্র দুইবার আবৃত্ত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে ।

৩. কোথা হনে আস্যা কোথা বিভা করা যায় । (শিবসঙ্কীর্তন, পৃঃ ৫৩)

এখানে 'কোথা' ধ্বনিগুচ্ছ একই ক্রমে বিযুক্তভাবে দুইবার ধ্বনিত হয়ে ধ্বনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে এবং ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে ।

৪. সপ্তদ্বীপে সপ্তসাগর বেড়া ।
দ্বিগুন দ্বিগুন সকল বাড়া ॥ (ঐ পৃঃ ২২)

এখানে প্রথম চরণে 'সপ্ত' শব্দটি দুইবার ধ্বনিত হয়ে ছেকানুপ্রাস হয়েছে । এবং দ্বিতীয় চরণে একই ক্রমে বিযুক্ত ভাবে দুইবার আবৃত্ত হওয়ায় ছেকানুপ্রাস হয়েছে ।

৫. দীর্ঘলোমা দীর্ঘদন্ত দহনবদন (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১৩১)

'দীর্ঘ' ধ্বনিগুচ্ছ একই ক্রমে বিযুক্ত ভাবে মাত্র দুইবার আবৃত্ত হওয়ায় এখানে ছেকানুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে ।

৬. দার-চিনি চন্দনি চন্দন চাঞ্চিচুয়া ।

এখানে 'ন্দ' ধ্বনিগুচ্ছ সংযুক্ত ভাবে একই ক্রমে মাত্র দুইবার ধ্বনিত হয়েছে । সুতরাং এটি ছেকানুপ্রাস হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

<u>ছেকানুপ্রাসের আরো দৃষ্টান্ত :</u>

৫.	কেহ ঘরে নাঞি কেহ থাকিয়া না শুনে ॥	(সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৮)
৬.	ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ ডাকে কলস্বনে ।	(ঐ পৃঃ ৮)
৭.	চকিতে চকিতে মূর্ত্তি ধরেন অশেষ ।	(ঐ পৃঃ ১৪)
৮.	দেখিতে দেখিতে হৈল ব্রাহ্মণের বেশ ॥	(ঐ পৃঃ ১৪)
৯.	তেকা ওকা গুনাহ্ নাহি সবি গুনাহ্ মেরা ।	(ঐ পৃঃ ৩৬)
১০.	হাসিতে হাসিতে হরি দ্বিজে কন তবে ।	(ঐ পৃঃ ১৪)
১১.	দেশে দেশে প্রতাপ জাহির হৈল বাড়া ।	(ঐ পৃঃ ২৭)
১২.	এত শুনি মনে মনে বিষ্ময় ব্রাহ্মণ ।	(ঐ পৃঃ ১৪)
১৩.	কহে কৃষ্ণ কি কৈলে কি কৈলে কলিকালে ।	(ঐ পৃঃ ২৯)
১৪.	কে করিবে আশ্বাস নিঃশ্বাস ঘন ছাড়ে ।	(ঐ পৃঃ ৯)
১৫.	দেখিয়া বিষ্ময় কলি হাসে খল খল ॥	(ঐ পৃঃ ১৫)
১৬.	তার চারি তরফে সুচারু চারি তীর ।	(ঐ পৃঃ ১৮)
১৭.	কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি কৈল বিস্তর রোদন ।	(ঐ পৃঃ ২১)
১৮.	ভিড়ে কেহ দেখে কেহ দেখিতে না পায় ।	(ঐ পৃঃ ২৭)
১৯.	পীর বলি না জানিবে না ছাড়িবে বেদ ॥	(ঐ পৃঃ ১৭)

Dhaka University Institutional Repository

২০. ওযা বিষণু গেলা বিষণুশর্ম্মার মন্দিরে । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২১)

২১. ত্রিদহ ত্রিদহ যদি আসে ওষ্ঠ পুটে । (ঐ পৃঃ ২৫)

২২. দিনে দিনে সিন্নি দানে পূর্ণ হৈল কাম । (ঐ পৃঃ ২৭)

২৩. যথা যথা দেহ সিন্নি যাহ বাপ মাঞি । (ঐ পৃঃ ২৮)

২৪. হেথা ঘরে ঝুরে সাধুয়ানী যুবতী ঝুরে ঝি । (ঐ পৃঃ ৩৪)

২৫. ও লোকাতি চোর উর তু লোকাতি সচ্চা ॥ (ঐ পৃঃ ৩৫)

২৬. বারো বরি খমে বারো গুন হোতা ॥ (ঐ পৃঃ ৩৬)

২৭. দপ দপ দীপক জ্বলিছে ধুনা মড়া । ((শিব-সঙ্কীর্ত্তণ , পৃঃ ৭৫)

২৮. সর্ব্বাঙ্গেঁ কিল কিল সদা করে কালসাপ । (ঐ পৃঃ ৮৫)

২৯. ধন্য তার জননী জনক তার ধন্য । (ঐ পৃঃ ৭০)

৩০. গদ গদ হয়্যা বলে কন্যা যোগ্য বর । (ঐ পৃঃ ৮৮)

৩১. বীনা আদি যত বাদ্য কত বাদ্য বাজে । (ঐ পৃঃ ৪০)

৩২. ধরিল ধরনী ধরণী ধর ॥ (ঐ পৃঃ ২১)

৩৩. ভ্রুকুটি করিয়া তাল তাল ভূমিতলে । (ঐ পৃঃ ৯৭)

৩৪. দার চিনি চন্দ্রানি চন্দন চাঞি চুয়া । (ঐ পৃঃ)

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. বিশ্ববীজ বিশ্বনাথ বেদ অগোচর । (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১৪৩)

৩৬. ভোগ পাবে উত্তম উত্তম পাবে মুক্তি ॥ (ঐ পৃঃ ১৪৫)

৩৭. যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রয় । (ঐ পৃঃ ১৫৭)

৩৮. ধরিল সহস্র ভুজে সহস্র আতর ॥ (ঐ পৃঃ ১৮৯)

৩৯. দন্ডবৎ পুনঃ পুনঃ হে দামোদরে ॥ (ঐ পৃঃ ১৪৪)

৪০. ধর ধর বলিয়া পশ্চাৎ ডাক ছাড়ে । (ঐ পৃঃ ১৬২)

৪১. প্রদ্যুম্ন প্রধান পুত্র তার পুত্র অনি । (ঐ পৃঃ ১৭৭)

৪২. বলে কেহ বান্ধ বান্ধ বিদার বিদার । (ঐ পৃঃ ২০৪)

৪৩. পাঁচ পাঁচ কুড়া তার পড়্যা যায় পাকে । (ঐ পৃঃ ২৩৭)

৪৪. হন হন করে ধান বলাহক যেন ॥ (ঐ পৃঃ ২৩৮)

৪৫. ক্ষেতে কত বিক্ষত করিয়া যেনখায় । (ঐ পৃঃ ২৪৪)

৪৬. যাবেক যাবেক চড়্যা যাবনাই আমি ॥ (ঐ পৃঃ ২৮২)

৪৭. জিজ্ঞাসিল যদুবৃন্দে যদুচান্দ কোথা ॥ (ঐ পৃ৯৭৭)

৪৮. মহাবল কেবল যুগল জুল যুঝে । (ঐ পৃঃ ১৮৫)

৪৯. বৃত্তিহীন জনকে যে বৃত্তি দিয়া পালে । (ঐ পৃঃ ১৩৭)

Dhaka University Institutional Repository

ক.১.৪ লাটানুপ্রাস: " তাৎপর্যমাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তিকে লাটানুপ্রাস বলে। যমকে অর্থের ভেদ হয়, কিন্তু লাটানুপ্রাসে অর্থ এক থাকলেও তাৎপর্যের ঈষৎ ভেদ হয়।"[৬]

দৃষ্টান্ত দেয়া হলো-

১. বাকসিদ্ধ যারে যে বলেন সিদ্ধ হয়। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২৮)

পংক্তিতে 'সিদ্ধ' শব্দটি তাৎপর্য মাত্রের ভেদে দুইবার আবৃত হয়েছে। 'বাকসিদ্ধ' অর্থ যিনি সিদ্ধ পুরুষ যার কথা ফলে যায় এমন একজন, আর 'সিদ্ধ' অর্থাৎ ঠিক হওয়া বা ফলে যাওয়া। এখানে দেখা যাচ্ছে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। কিন্তু এতে তাৎপর্যের ভেদ রয়েছে। সুতরাং উদ্বৃতিটি লাটানুপ্রাস হয়েছে।

২. নাম ভেদ তাহাতে নৈবেদ্যমাত্র ভেদ। (ঐ পৃঃ ১৭)

এখানে 'ভেদ' শব্দটি দুবার আবৃত্ত হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে তাদের অর্থ এক থাকলেও তাৎপর্যের একটু পার্থক্য আছে। সুতরাং এটি লাটানুপ্রাস।

৩. দশ মহাবিদ্যা বন্দোদম অবতার। (ঐ পৃঃ ২)

'দশ' তাৎপর্য মাত্রের ভেদে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি লক্ষনীয়।

৪. শুনিতে সুন্দর শিব সেবিতে সুন্দর। (শিব সঙ্কীর্তণ, পৃঃ ৬৭)

এখানে 'সুন্দর' শব্দটি দুইবার আবৃত্ত হয়েছে। তাদের অর্থ এক হলেও বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, একটি 'সুন্দর' অর্থ শোভন অপর 'সুন্দর' অর্থ ভাল। এখানে সুন্দর শব্দটির অর্থ এক হলেও তাৎপর্য কিছুটা পার্থক্য থাকায় লাটানুপ্রাস হয়েছে।

৫. সোহাগী সন্তাপ করে সোহাগীর তরে। (ঐ পৃঃ ৯০)

'সোহাগী' শব্দটির একই অর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাৎপর্যের দিক থেকে একটু তফাত রয়েছে বলে এটি লাটানুপ্রাস হয়েছে।

---

৬. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃঃ ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

লাটানুপ্রাসের আরো উদাহরণঃ

৭. মোর অধিকারে অধিকার কি তোমার । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ১৬)

৮. অষ্ট সখী অল্প কুঞ্জও অল্প কুঞ্জও সার । (ঐ পৃঃ ২)

৯. খেতে চারি চালু নাঞি চালে নাঞি খড় । (ঐ পৃঃ ৭)

১০. জানা গয়া বাত বাওয়া জানা গয়া বাত । (ঐ পৃঃ ২২)

১১. পবওদেব পবও পূজা পবও উপচারে । (ঐ পৃঃ ১৮)

১২. সম্ভব বৈভব ভব সব সওয়া সওয়া ॥ (ঐ পৃঃ ১৯)

১৩. না থাকে দুর্গতি তার না থাকে দুর্গতি । (ঐ পৃঃ ২০)

১৪. ওথা বিষ্ণু গেলা বিষ্ণুশর্ম্মার মন্দিরে । (ঐ পৃঃ ২১)

১৫. যে হোক সে হোক দুঃখ গেল অতঃপর । (ঐ পৃঃ ২২)

১৬. কহে কৃষ্ণ কি কৈলে কি কৈলে কলিকালে । (ঐ পৃঃ ২৯)

১৭. হেথা ঘরে ঝুরে সাধুয়ানী যুবতী ঝুরে ঝি । (ঐ পৃঃ ৩৪)

১৮. জওতো ওহিলেতা মাত্তা জওতো ওহিলেতা । (ঐ পৃঃ ৩৬)

১৯. তেকা ওকা গুনাহ্ নহি সবি গুনাহ্ মেরা । (ঐ পৃঃ ৩৬)

২০. বারো বরিখমে বারো গুন হেতা ॥ (ঐ পৃঃ ৪১)

২১. পবনে পবনতুল্য চালাল তরনী । (ঐ পৃঃ ৪১)

২২. হায় হায় কি হৈল কি হৈল লোকে বলে । (ঐ পৃঃ ৪২)

২৩. পুনমিব অল্প রাগ রসিকের রাগে । (ঐ পৃঃ ৩)

২৪. কেহ গালি দেয় কেহ করে দুর দুর । (ঐ পৃঃ ৮)

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ভলা বাওয়া কাহে তেরা মৃত্যুকাল কাহে । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ১২)

২৬. জওতো সৎপীর মেরা জও তো সৎপীর । (ঐ পৃঃ ১২)

২৭. পুন্য হলো শূন্য কল্যে পাপ হল্যে পুন্য । (শিব--সঙ্কীর্তণ, পৃঃ ১৭)

২৮. অল্পশ্রমে অল্পধনে অল্পদিনে কথা । (ঐ পৃঃ ১৭)

২৯. দারুন যমের দূত যমের আদেশে । (ঐ পৃঃ)

৩০. কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথে চড়্যা । (ঐ পৃঃ ১৫৮)

৩১. মহাবল বাজে বান বানে বান তাড়ে । (ঐ পৃঃ ১৯০)

৩২. বিবিধ বিবুধ বিবিধ নদী ।। (ঐ পৃঃ ২২)

৩৩. কর্ম্মভূমে কুকর্ম্ম করিলে অধোগতি ।। (ঐ পৃঃ ২৩)

৩৪. শিবের কি ক্ষতি ক্ষতি দক্ষের কেবল ।। (ঐ পৃঃ ৩৯)

৩৫. দান ধর্ম্ম ফেলে দান ফেলে বুড়ি বুড়ি ।। (ঐ পৃঃ ৫৪)

৩৬. আকুল হয়্যাছে প্রান হয়্যাছে উদবেগ । (ঐ পৃঃ ৮৪)

৩৭. এসিন এয়োর মাঝে এয়োর স্বহিত ।। (ঐ পৃঃ ৮৮)

৩৮. চক্ষু চাপ্যা চাড়ু কর্য়া চাড়ু বলে কি । (ঐ পৃঃ ৯০)

৩৯. নিজ নাথে নিন্দা কল্যা নিন্দা করে তারা ।। (ঐ পৃঃ ৯১)

৪০. ধরিল সহস্র ভুজে সহস্র আতর ।। (ঐ পৃঃ ১৮৯)

৪১. সাধু শব্দ নমঃ শব্দ জয় শব্দ কর্য়া । (ঐ পৃঃ ১৯৮)

৪২. কার হাতে লৌহদন্ড কার হাতে নড়ি । (ঐ পৃঃ ২০৪)

Dhaka University Institutional Repository

ক.১.৫ শ্রুত্যনুপ্রাসঃ

সাদৃশ্যময় ব্যঞ্জন ধ্বনি যদি বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয় তখন তাকে শ্রুত্যনুপ্রাস বলা হয়।

এ অনুপ্রাস অন্ত্যানুপ্রাসের সহকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। ক,খ,গ,ঘ, সদৃশ ধ্বনি - এমনি মত চ, ছ, ট,ঠ অর্থাৎ বর্গের প্রথম-দ্বিতীয়, তৃতীয় - চতুর্থ কখনো বা প্রথম-তৃতীয়, দ্বিতীয়-চতুর্থ বর্ণের মিলও বাঙলায় দুর্লভ নয়। এবং র, ড় যদিও একটি কম্পনজাত আর অন্যটি তাড়নজাত ধ্বনি তবু এদের উচ্চারণ সাদৃশ্যের জন্য অনেক সময় শ্রুত্যনুপ্রাস হয়ে থাকে।[৭]

কতিপয় দৃষ্টান্ত দেয়া হলো -

১. বন্দো বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাগন। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৪)

এখানে ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত 'ব' 'ব', 'ব', 'ব' 'ব' ব্যঞ্জন ধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ আছে বলে শ্রুত্যনুপ্রাস হয়েছে।

২. বিধি বড় ভাই মোর মহেন অনুজ। (ঐ পৃঃ ৪)

এখানেও ওষ্ঠ থেকেউচ্চরিত 'ব' 'ব' 'ভ' 'ম' এবং 'ম' ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশ থাকায় শ্রুত্যনুপ্রাস হয়েছে।

৩. চলিল চৈতন্য চান্দ ছাড়িয়া সকল ॥ (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১১)

পংক্তিতে তালব্য ধ্বনির শ্রুতিমধুর সমাবেশ 'চ' 'চ' 'চ' 'ছ' 'ন' এবং 'ন' বাগযন্ত্রের একই স্থান থেকে উচ্চারিত হয়েছে এবং শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টি হয়েছে।

৪. বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর রাজ। (ঐ পৃঃ ৫৯)

পঙক্তিতে ওষ্ঠ থেকে উচ্চরিত 'ব' 'ভ' 'ব' 'ব' 'ব' ব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশ ঘটেছে এবং শ্রুত্যনুপ্রাস অলংকার হয়েছে।

---

৭. নরেন বিশ্বাস, অলঙ্কার অন্বেষা (ঢাকাঃ ১৯৭৬), পৃঃ ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

শ্রুত্যনুপ্রাসের আরো উদাহরণঃ

৫. চক্রপাণি চিমিতে নারিলে চন্দ্রমুখী ।। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২৩)

৬. সমর্পিলে সত্যনাথে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ।। (ঐ পৃঃ ১৯)

৭. দাস দুঃখ দেখি দামোদরে হৈল দয়া । (ঐ পৃঃ ৯)

৮. বনিতা বচনে বিপ্র বারিপূর্ণ আঁখি । (ঐ পৃঃ ২৩)

৯. প্রকারের পীরের পদ পরম কারন । (ঐ পৃঃ ২৯)

১০. ধৈরজ না ধরে দ্বিজ ধৈরজ না ধরে । (ঐ পৃঃ ৯)

১১. জিজ্ঞাসিতে জায়া জনকের কথা কয় ।। (ঐ পৃঃ ২৩)

১২. দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশ পুর । (ঐ পৃঃ ৭)

১৩. শুন সবে সত্য সত্য সত্য মনোরম ।। (ঐ পৃঃ ২৯)

১৪. প্রসাদ ফেলেছে পীরের আছে পূর্ণ কোপ । (ঐ পৃঃ ৪১)

১৫. কহে কৃষ্ণ কি কৈলে কি কৈলে কলিকালে । (ঐ পৃঃ)

১৬. পৃথিবীতে পূজার প্রচার তবে হয় ।। (ঐ পৃঃ ১৭)

১৭. বাঞ্ছা বড় বাড়িল বর্ষিতে ব্রতকথা । (ঐ পৃঃ ১)

১৮. রসাল রসিক প্রিয় রমাইব রাগে । (ঐ পৃঃ ১)

১৯. বন্দো বহ্নি বিপ্র বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ ।। (ঐ পৃঃ ১)

২০. প্রনমির প্রভুর প্রেয়সী যত নারী ।। (ঐ পৃঃ ২)

২১. প্রবল প্রতাপ প্রভু পাপ-তাপহারী । (ঐ পৃঃ ৭)

Dhaka University Institutional Repository

২২. বিষাদে বসিল বিপ্র বট-বৃক্ষতলে ।। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৮)

২৩. মনস্তাপে মরিতে বসেছি ওই পাকে ।। (ঐ পৃঃ ১১)

২৪. নাবক ব্যাপক বিশ্বদাহকের লেখা ।। (ঐ পৃঃ ২৫)

২৫. বাজানি বিষান বুড়া বাড়ীর নিকটে । (শিব-সঙ্কীর্ত্তণ পৃঃ ১০০)

২৬. অরুন ভাঙ্গৈ গুঁড়া ভষ্ম বিভূষণ । (ঐ পৃঃ ৬৬)

২৭. মদন মরিল পুড়্যা হইয়া বিকল ।। (ঐ পৃঃ ৬৬)

২৮. দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাহি আর । (ঐ পৃঃ ৬৭)

২৯. বুড় কত কালের কহিতে নারে কেহ । (ঐ পৃঃ ৬৭)

৩০. ভামিনী ভবনে বস্যা ভগবান লভে ।। (ঐ পৃঃ ৬৯)

৩১. কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটী মুরছিত ।। (ঐ পৃঃ ৯৬)

৩২. শুনিয়া শিবের শব্দ সীমন্তিনীগন । (ঐ পৃঃ ৯৭)

৩৩. চমৎকার চন্দ্রচূড় চন্ডীপানে চান ।। (ঐ পৃঃ ১০৯)

৩৪. দুস্কীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি । (ঐ পৃঃ ১০৯)

৩৫. কিঞ্চিত করিয়া কোপ কহিলেন ভব । (ঐ পৃঃ ১০৯)

৩৬. দিগম্বর দেখ্যা দূর করিল শাশুড়ী ।। (ঐ পৃঃ ১১২)

৩৭. কামধেনু কুবেরে করিল তিরস্কার ।। (ঐ পৃঃ ১১৩)

৩৮. যোগীর যোগের ঝুলি যোগিনীর ঠাঁঞি । (ঐ পৃঃ ১১৩)

৩৯. চক্রপানি চরিতার্থ চক্রিকের বোলে । (ঐ পৃঃ ১৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

ক.২ যমকঃ

"একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনিসহ নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক কিংবা নিরর্থকভাবে যদি একাধিকবার উচ্চারিত হয়, তবে তাকে যমক অলংকার বলা হয়।"[৮]

উন্নত ভাষাসমূহে এমন বহু শব্দ আছে যার একাধিক অর্থ বর্তমান। এবং যুগে যুগে কবিগন কাব্যে বিচিত্র শব্দলীলা দেখাবার জন্যে একই শব্দকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। প্রচলিত অলংকার গ্রন্থসমূহে চার রকমের যমকের উল্লেখ আছে। আদ্য, মধ্য, অন্ত্য এবং সর্ব যমক। রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যগুলিতে মোটামুটি তিন ধরনের যমক ব্যবহার করেছেন।

যমকের উদাহরণ দেয়া হলো –

১. আত্ম উপবাস অন্ন অন্য জনে দিয়া। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৭)

এখান, ,'অন্ন' শব্দের অর্থ ভাত বা আহারাদি, দ্বিতীয় 'অন্য' শব্দের অর্থ অপর বা আলাদা ইত্যাদি। একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসহ দুইবার দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এখানে যমক অলংকার হয়েছে।

২. নানা রূপে বিড়ম্বিয়া হরিলেন হরি। (ঐ পৃঃ ৮)

এখানেও একই 'হরি' শব্দের দুইটি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে। একটি হরি শব্দের অর্থ হরণ করা এবং অপর 'হরি' বিষ্ণুর অপর নাম। একই শব্দ 'হরি' একই স্বরধ্বনিসমেত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে যমক অলংকার সৃষ্টি করেছে।

৩. অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে। (শিব-সঙ্কীর্তণ পৃঃ ১০৪)

পংক্তিতে 'অন্ন' অন্নপূর্ণার অংশবিশেষ এবং অন্ন অর্থ ভাত বা আহারাদি ইত্যাদি। একই শব্দ একই স্বরধ্বনিসহ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে যমক অলংকার হয়েছে।

৪. জগবন্ধু করয়া বন্ধু ভবসিন্ধু তরে। (ঐ পৃঃ ১৩৩)

'জগবন্ধু' একটি নাম এবং 'বন্ধু' অর্থ মিত্র, সখা, সুহৃদ সুজন বা প্রিয় ইত্যাদি। একই শব্দের ভিন্নার্থে লক্ষনীয়। সুতরাং এটি যমকের উদাহরণ।

---

৮. নরেন বিশ্বাস, অলঙ্কার অন্বেষা, পৃঃ ৪৪।

Dhaka University Institutional Repository

তিন প্রকার যমকের দৃষ্টান্ত দেয়া হলোঃ

ক.২.১ অদ্য যমকের উদাহরণ

১.	গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিনীর গুনে।	(শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ২১৫)
২.	হরিয়া হরির ধন হরি লয়্যা যায়।	(ঐ পৃঃ ১৬১)
৩.	রণশিঙ্গা সাথিরঙ্গ রনকিনী তুরী।	(ঐ পৃঃ ৪০)
৪.	জ্ঞান-সিন্ধু শিবকে অজ্ঞান বলে ক্ষেপা।	(ঐ পৃঃ ৩২)
৫.	যজ্ঞেশ্বর জামাতাকে যজ্ঞে নহি আন্যা।	(ঐ পৃঃ ৩১)
৬.	অগ্নিকোনে অগ্নি বন্দ দক্ষিনে শমন ॥	(ঐ পৃঃ ১৩)
৭.	বায়ুত্তরে বায়ু বন্দ ঈশানে মহেশ ॥	(ঐ পৃঃ ১৩)
৮.	অতল বিতল সুতল তলে ।	(ঐ পৃঃ ২১)
৯.	ধূলার পগার দিল ধূলার প্রাচীর।	(ঐ পৃঃ ৪৯)
১০.	শাক দিল শাকমুরি সজিনার পাতা ॥	(ঐ পৃঃ ৫১)
১১.	যমবাক্য যমদূত জানিয়া নিশ্চয় ॥	(ঐ পৃঃ ২১০)
১২.	অন্নপূর্ণা বলে আমি অন্ন হেতু ঝুরি ॥	(ঐ পৃঃ ২৩২)
১৩.	চন্দ্রমুখী বিনা চন্দ্র দেখি শূন্যবৎ ॥	(ঐ পৃঃ ৩০১)
১৪.	তল অলাতল সে রসাতল।	(ঐ পৃঃ ২১)

Dhaka University Institutional Repository

ক.২.২ মধ্য যমকের দৃষ্টান্তঃ

১. পুজিলে পীরের পদ নিরাপদ নর । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২০)

২. আর সবিশেষ উপদেশ বলি শুন ।। (ঐ পৃঃ ৩০)

৩. জীবন্তী তাহার জায়া যায়্যা বাপঘরে ।। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১২৯)

৪. যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া ।। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৮)

৫. একমাত্র অরূপ অশেষ রূপ ধরে । (শিব-সঙ্কীর্তণ, পৃঃ ১৯)

৬: দক্ষ পক্ষ বিপক্ষ দেখিয়া দড়বড় । (ঐ পৃঃ ৪০)

৭. শ্রদ্ধা করয়া কহে হর হয়্যা রহরষিত । (ঐ পৃঃ ১১৯)

ক.২.৩ অনু যমকের দৃষ্টান্তঃ

৮. অনু বস্ত্র বিবর্জ্জিত ভিক্ষার ভরুন । (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২৫)

৯. কৃপার কি চিহ্ন এত ক্ষেপার লক্ষন । (ঐ পৃঃ)

১০. কৃষ্ণ যার সখা তার কি করে পাবক ।
আহলাদ রহিল হেন প্রহলাদ সেবক ।। (ঐ পৃঃ ২৬)

১১. সার্ব্বভৌম বলে বিষ্ণুশর্ম্মার মাতুল ।
তার কুলাঙ্গার কেন হইলি বাতুল ।। (ঐ পৃঃ ২৪)

১২. আনন্দিত হৈয়া দেখিবেন সব ।
হর-গৌরী বিবাহ মংগল মহোৎ সব ।। (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৭২)

Dhaka University Institutional Repository

ক. ৩. শ্লেষ :

" একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহার করেও কবি যদি তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন তর্থের ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সক্ষম হন - এবং পাঠক সাধারন একাধিক অর্থেই তাকে গ্রহন করেন, তখন তাকে শ্লেষ বা শব্দ শ্লেষ অলংকার বলা যায় । " ১

শ্লেষের কতিপয় উদাহরন দেয়া যাক :-

১. যাঁহার প্রসাদে দেখি এ সব সৃজন ।। (সত্যপীরের কথা পৃঃ ৩)

পংক্তিস্থতে ' প্রসাদে ' শব্দটির দুটি অর্থ আছে যেমন প্রসাদে অর্থ কৃপায় বা অনুগ্রহে, এবং প্রসাদে অর্থ দেব নিবেদিত বস্তু । যার কৃপায় এ সব সৃষ্টি হলো কবি তাকে বন্দনা করবেন এবং তাকে প্রসাদ দেবেন বা পূঁজা দেবেন যিনি এ সব সৃষ্টি করেছেন । একই শব্দ দুটি অর্থ প্রকাশ করছে বলে এখানে শ্লেষ অলংকার হয়েছে ।

২. বিরহে বিদরে বুক স্মর শরজাল (ঐ পৃঃ ৩৪)

এখানে ' স্মর' শব্দটি মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়ে একাধিক অর্থ বোঝাছে 'স্মর ' শব্দটির এক অর্থ স্মরন করা বা স্মৃতি এবং অপর অর্থ বিষ্ণু । বিষ্ণুর বিরহে বুকের মধ্যে বান বিদ্ধ হয় । একটি শব্দ একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়ে একাধিক অর্থ বোঝাছে বলে এটি শ্লেষ অলংকার হয়েছে ।

৩. পূঁজার পদ্ধতি ভাষা রচে দিল তবে । (ঐ পৃঃ ২৮)

'ভাষা' অর্থ 'ভাষা ' অর্থাৎ বাঙলা ভাষা , ইংরেজী ভাষা ইত্যাদি । আবার 'ভাষা ' অর্থ ব্যাখ্যা করা । সুতরাং ' ভাষা ' শব্দটি একাধিক অর্থ বুঝাছে বলে এটি শ্লেষ অলংকার ।

---

১. নরেন বিশ্বাস, অলংকার অন্বেষা, পৃষ্ঠা : ৪৬ ।।

Dhaka University Institutional Repository

৪. স্বামীর সম্পদ যত সেবকের ঠাঁঞি ।। (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১১১)
বিষয়ে মোহিত হয়্যা তত্ত্ব করে নাই ।।

এখানে প্রথম চরনে ' স্বামী ' এবং ঠাঁঞি দুটি শব্দরই একাধিক অর্থ বোঝাচ্ছে । ' স্বামীর একটি অর্থ হলো প্রভু বা মালিক বা অধিপতি , এবং অপর অর্থটি হচ্ছে পতি । ঠাঁঞি ' এর একটি অর্থ কাছে বা নিকটে এবং অন্য অর্থ ঘরে । সুতরাং এটি শ্লেষ অলংকারের উদাহরন ।

৫. শিবানিয়্যা হয়্যা শিবা সঙ্গে লয়্যা সখী । (ঐ পৃঃ ১০৮)
আলো করা কৈলাসে বসিলা বিধুমুখী ।।

দ্বিতীয় চরনে 'কৈলাস' শব্দটি দুইটি অর্থ বোঝাচ্ছে , এক কৈলাস অর্থ আনন্দ এবং অপর 'কৈলাস' অর্থ শিবের বাসস্থান কৈলাস পর্বত । সুতরাং উদ্ধৃতিটি শ্লেষ অলংকারের উদাহরন ।

শ্লেষের আরো উদাহরন ঃ

৬. বিপদে বিকল হয়্যা বালকের প্রায় । (ঐ পৃঃ ১১৯)
ডাকিছে ডাহুকী যেন বক যদুরায় ।।

৭. অধোমুখ আধার ধুননে ধায় ধন । (ঐ পৃঃ ১১৩)
প্রবাল মুকুতা হীরা যতেক কাঞ্চন ।।

৮. বিষ্ঠা তার কোথা আর সাক্ষাৎ শরীর। (ঐ পৃঃ ১২২)

৯. আত্মারাম আজি রাম বসে হয়্যা তোর । (ঐ পৃঃ ১০৯)
ভুলা্যা গেল ভিক দুঃখ ভাবে নাই ওর ।।

১০. রক্ষিনী বাজার বেটী রন্ধু করি স্থানে । (ঐ পৃঃ ১১১)
তৈল বিনে তনু ক্ষীন খড়ি উজ্যা যান ।।

Dhaka University Institutional Repository

ক.৪. পুনরুক্তবদাভাস :

'পুঃ + উক্ত + বৎ + আভাস = পুনরুক্তবদাভাস।

আপাত দৃষ্টিতে কোন বাক্যে যদি মনে হয় একই অর্থে একাধিক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, অথচ একটু মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষন করলেই বোঝা যায় যে, আসলে তারা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত তাহলে সেখানে পুনরুক্তবদাভাস হয়।" ১০

দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :-

১. আলিপনা দিবে ধ্বজা পতাকা নিশান ।। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ১৮)

এখানে ধ্বজা, পতাকা এবং নিশান শব্দের একই অর্থ বোঝাচ্ছে। অতএব উদ্ধৃতিতে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার সৃষ্টি হয়েছে।

২. দিবা অট্টালিকা ঘর বেষ্টিত প্রাচীর। (ঐ পৃঃ ২৬)

পংক্তিতে 'অট্টালিকা' এবং ঘর শব্দের একই অর্থ কিন্তু বিশ্লেষনে দেখা যায় অট্টালিকা শব্দের অর্থ প্রাসাদ বা দালান এবং ঘর শব্দের অর্থ ঘর, গৃহ বা - আবাস। এখানে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে একই অর্থের একাধিক শব্দের ব্যবহার হয়ে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার সৃষ্টি হয়েছে।

৩. ধনুক সহি শর সত্বরে কাটিল। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১৮৩)

এখানে ধনুক এবং শর এর অর্থ এক। কিন্তু গভীর বিশ্লেষনে এর অর্থ ভিন্ন। সুতরাং এ পুনরুক্তবদাভাস এর দৃষ্টান্ত।

৪. তাবৎ সকল পাপ সবাকার দেহে। (ঐ পৃঃ ১৩৮)

এখানেও দেখা যাচ্ছে 'তাবৎ' এবং সকল দুইটি শব্দের অর্থই সমস্ত বা সব অর্থাৎ দুইটি শব্দের একই অর্থ। কিন্তু বিশ্লষনে কিঞ্চিত ভিন্নতা আছে। সুতরাং এটি পুনরুক্তবদাভাসের দৃষ্টান্ত।

---

১০. নরেন বিশ্বাস, পৃষ্ঠা - ৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

পুনরুক্তবদাভাসের আরো উদাহরণ :

৫. দর্প চূর্ণ বালা অহঙ্কার কৈল লোপ । (সত্যপীরের কথা , পৃঃ ৪)

দর্প এবং অহঙ্কার শব্দটির অর্থ প্রায় এক, বিশ্লেষনে দেখা যায় দর্প অর্থ দাপট । বাক্যটিতে একার্থক একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় পুনরুক্তবদাভাস অলংকার সৃষ্টি হয়েছে ।

৬. সুমিষ্ট সুসিক্ত যত পুরমাগ চতুষ্পথ
কত ধ্বজ পতাকাদি শোভা ॥ (শিব সঙ্কীর্তন , পৃঃ ১৫২)

৭. পঞ্চশত ধনুকে ধরিয়া দু দু শর ।
মার মার করয়া ছাড়ে কৃষেওর উপর ।। (ঐ পৃঃ ১৮৪)

৮. সবেগে ধনুর শর সত্বর ছুটিল ।
ধনুক সহিত শর সকল কাটিল ।। (ঐ পৃঃ ১৮৪)

৯. শ্রাদ্ধে বা তর্পনে দানে মহামহোৎসব (ঐ পৃঃ ১৩৮)

শ্রাদ্ধে , তর্পনে এবং দানে শব্দ তিনটির অর্থ প্রায় এক হলেও গভীর বিশ্লেষনে এর ভিন্নার্থ ধরা পরে, সুতরাং সংজ্ঞানুসারে এটি পুনরুক্তবদাভাসের উদাহরন ।

১০. তৈল বিনে তনু ক্ষীন খড়ি উড়্যা যায় । (ঐ পৃঃ ১১১)

এখানে তনু এবং ক্ষীন শব্দটির অর্থ এক । তনু শব্দটি এখানে সরু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।

১১. যজ্ঞদানে ব্রতে বা সেবিতে সর্ব্ব দেবে ॥ (ঐ পৃঃ ১৩৮)

পংক্তিটিতে তিনটি শব্দের অর্থই এক, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে বিচার করলে এর ভিন্নতা ধরা পরে । সুতরাং উদাহরনটি পুনরুক্তবদাভাসের দৃষ্টান্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. অর্থালংকার :

অর্থালংকার :

"যে অলঙ্কার একানুভাবে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দাবলীর অর্থের আশ্রয় গ্রহন কোরে সৃষ্ঠ হয় তাকে অর্থালঙ্কার বলে।"[১১]

অর্থালঙ্কারকে সাধারন লক্ষনানুযায়ী প্রধানত : পাঁচ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে (১) সাদৃশ্যমূলক (২) বিরোধমূলক (৩) শৃঙ্খলামূলক (৪) ন্যায়মূলক (৫) গূঢ়ার্থমূলক।

সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে (১) উপমা (২) রূপক (৩) উৎপ্রেক্ষা, (৪) সন্দেহ (৫) অপহ্নুতি (৬) নিশ্চয় (৭) ভ্রান্তিমান (৮) অতিশয়োক্তি (৯) ব্যতিরেক (১০) প্রতীক (১১) সমাসোক্তি (১২) প্রতিবস্তুপমা (১৩) দৃষ্টান্ত (১৪) নিদর্শনা।

এদের মধ্যে যে কোন অলঙ্কারের উদাহরনকে সাদৃশ্যমূলক অর্থালঙ্কারের উদাহরন হিসাবে গ্রহন করা যেতে পারে।"[১২]

খ.১. উপমা :

"একই বাক্যে সাধারন ধর্ম বিশিষ্ট দুইটি বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা হলে উপমা অলংকার হয়।"[১৩]

সাধারনত: 'উপমা' শব্দটি তুলনা অর্থেই বহুল ব্যবহৃত। ইংরেজীতে SIMILE বলতে বিসদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য আবিস্কার বোঝায়। এক কথায় যে বস্তু সে বস্তু নয়, (তবু) সেই বস্তুর মতন। তুলনার উপর ভিত্তি করে কাব্য সাহিত্যে যে প্রচুর অলংকার সৃষ্টি করা হয়, সে সমস্ত অলংকারকেই আমরা সাধারনত উপমা বলে থাকি।"[১৪]

---

১১. নরেন বিশ্বাস, পৃষ্ঠা : ৫৪
১২. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃষ্ঠা : ৩২
১৩. ঐ পৃষ্ঠা : ৩৩
১৪. নরেন বিশ্বাস, পৃষ্ঠা : ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সাধারনত উপমার চারটি অঙ্গ থাকে (১) উপমেয় (২) উপমান (৩) সাধারন ধর্ম এবং (৪) সাদৃশ্যবাচক শব্দ। এই চারটি অঙ্গের উপস্থিতিতে একটি উপমা হয়ে উঠে পূর্নোপমা, এদের একটি বা দুইটির অনুপস্থিতিতে উপমা হয় লুপ্তোপমা, এবং একটি উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকলে মালোপমা অলংকার হয়।

কবি উপমান সংগ্রহ করেছেন নিসর্গ, মানুষ, বস্তু ও প্রাচীন কাব্য জগতের বিচিত্র উৎসে পরিভ্রমন করে। উপমা ব্যবহারে তিনি মধ্যযুগের কবিদের মত প্রথাবদ্ধ ও ঐতিহ্য শাসিত।

কাব্য দু'টি থেকে উপমার উদাহরন দেয়া হল :-

১. শক্তেতে শমন সম ধনে ধনপতি। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ২০

পংক্তিতে পীরের পূজারীর শক্তির সাথে যমের শক্তির তুলনা করা হচ্ছে। উদ্ধৃতিটিতে বলা হয়েছে যে, সত্যপীরকে পূজা দেবে সেই পূজারীর শক্তি হবে সমন অর্থাৎ যমের মতো এবং সে ধনে হবে কুবের তুল্য। এখানে উপমেয পূজারী উপমান সমন এবং ধন কুবের, তুলনা বাচক শব্দ সম।

২. ডরে কলি তারে হস্তী সিংহকে যেমন। (ঐ পৃঃ ২০)

এখানেও পূজারীর মাহাত্ম্য বর্ননা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, যে সত্যপীরকে পূজা দেবে তাকে অর্থাৎ সেই পূজারীকে 'কলির' মতো বিকট, জগুপ্সিত ভয়ংকর ব্যক্তিও ভয় করবে, হাতি যেমন সিংহকে ভয় পায়। এখানে উপমেয় পূজারী এবং সিংহ, উপমান কলি ও হস্তী, সাদৃশ্যবাচক শব্দ যেমন এবং সাধারন ধর্ম ডরে দেখা যাচ্ছে, পদ্ধতিটিতে উপমার চারটি অঙ্গই উপস্থিত। সুতরাং এটি পূর্নোপমার দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩. চুকি বলে আরে মোর ছার কপাল ছি ।
অন্ধ বরে বিহা দিনু চন্দ্রা হেন ঝি । (শিব-সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৮৯)

এখানে উপমেয় ঝি এবং উপমান চন্দ্রা, সাদৃশ্যবাচক শব্দ হেন । চন্দ্রা অর্থ আনন্দদায়িক বা চাঁদ অর্থাৎ 'ঝি' কে অর্থাৎ মেয়েকে চাঁদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে । সুতরাং সংজ্ঞানুসারে এটি উপমার দৃষ্টান্ত ।

৪. "প্রভাত কালের ভানু সমান সুন্দর তনু
সুন্দরীর শিলতা সম্ভব ।" (ঐ পৃঃ ৮০)

উদ্ধৃতিটিতে উপমেয় সুন্দর তনু, উপমান প্রভাত কালের ভানু, সাদৃশ্যবাচক শব্দ সমান ।

সুন্দরীর সুন্দর কোমল শরীরটি যেন ভোরের কোমল সূর্যের মতই নরম । সুতরাং এটি উপমার দৃষ্টান্ত ।
উপমার আরো উদাহরন নীচে দেয়া হলো :-

৫. শত্রু সম ধনে জনে বাড়িলেক অল্প দিনে
পরলোকে জিনিলেক যম । (সত্যপীরের কথা পৃঃ)

৬. দুই মহাযোদ্ধা পতি দুই সম শর (শিব সঙ্কীর্তন পৃঃ ১৮৩)

৭. উষ্ঠ সম চরন মাতঙ্গ সম মুক্ত । (ঐ পৃঃ ২৪৯)

৮. কোকিল জিনিয়া ভাষা খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা
খঞ্জন - গঞ্জন দুটি আঁখি । (ঐ পৃঃ ২৫৯)

৯. কলাকলানুরে কথা পুরানের মত (ঐ পৃঃ ৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

১০. রবিশশী খচিত কুণ্ডলমণ্ডিত
শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা (শিব সঙ্কীর্ত্তন, পৃঃ ১৬০)

১১. দাপ্যাইল শূল ধরি যেমন ভাস্কর গিরি
ডাকে যেন প্রলয়ের মেঘ (ঐ পৃঃ ৩৯)

১২. সিংহ ব্যাঘ্র মেষ মূষা মার্জ্জারের মত
মুখপাতি মহারথী গিলে শত শত ॥ (ঐ পৃঃ ৪২)

১৩. শঙ্কর কন্যার বর কেন হেন দেখি ।
মনে মনে বিচার করন শশিমুখী ॥ (ঐ পৃঃ ৮০)

১৪. সুপ্রকাশ বৈষ্ণব বিষ্ণুর সম বল (ঐ পৃঃ ১৩৪)

১৫. শিশু সূর্য্যসম আঁখি রোষে কুটুভাষে (ঐ পৃঃ ১৩২)

১৬. কত কোটী কল্প বসস কত কোটী বিধি
রচনা করিল হেন বসময় নিধি ॥ (ঐ পৃঃ ৮৮)

১৭. কার্য্যে দাসী সমা পৃথ্বী সম ক্ষমা
যুক্তি মন্ত্রী সম মাধবী ॥ (ঐ পৃঃ ৩১৫)

১৮. চন্দ্রমুখী বিনা চন্দ্র দেখি – শূন্যবৎ ।
কৈলাস যেমন হৈল কাননের মত ॥ (ঐ পৃঃ ৩০১)

১৯. শিশুসূর্য্য সমান মূর্চ্ছিত মৃত প্রায় ।
তুল্যা নিল যমদূত বল্যা হয় হায় ॥ (ঐ পৃঃ ১৩৪)

২০. বিষ্ণুদূত বিষ্ণুর সমান তেজ ধরে ।। (ঐ পৃঃ ১৩১)

২১. শঙ্কর কন্যার বর কেন হেন দেখি ।
মনে মনে বিচার করন শশিমুখী ॥ (ঐ পৃঃ ৮০)

Dhaka University Institutional Repository

খ.২. রূপক :

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যগুলিতে উপমার মতো রূপকও ব্যবহার করেছেন।

উপমান- উপমেয় যখন অভেদার্থে ব্যবহৃত তখন রূপকের সৃষ্টি । উপমার দূরত্ব অপসৃত উৎপেক্ষায়, রূপক উৎপ্রেক্ষা অপেক্ষা ঘন, গাঢ় ও দৃঢ় । কেননা - এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ বা সন্দেহ কোনটিই প্রযুক্ত হয় না । উপমার সংহত ঘনীভূত রূপ রূপক । তিনি তাঁর কাব্যে প্রচুর রূপক ব্যবহার করেছেন ।

জীবেন্দ্র সিংহ রায় রূপকের সংজ্ঞা দিয়েছেন -
এভাবে- " উপমেয়ের সাথে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হলে রূপক অলংকার হয় । রূপকে ক্রিয়াটি হয় উপমানের অনুযায়ী । "[১৫]

রূপকের কতপয় দৃষ্টান্ত :

১. অতঃপর বন্দির রহিম রাম রূপ (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৫)

এখানে রাম (উপমেয়) এর সাথে রহিম (উপমান) এর অভেদ কল্পনা করা হয়েছে । বন্দির ক্রিয়াপদটি এখানে সংগতিপূর্ণ । সুতরাং উদাহরনটি রূপক অলংকারের

২. পুলকে প্রেমের সিন্ধু উথলিয়া উঠে । (ঐ পৃঃ ২১)

প্রেম রূপ সিন্ধু । উথলিয়া ক্রিয়া উপমান সিন্ধু অনুসারী সুতরাং উদ্ধৃতিটি রূপক অলংকারের

৩. আনন্দসাগরে যেন ডুবিল প্রসুর । (ঐ পৃঃ ২০)

আনন্দ রূপ সাগর, ডুবিল ক্রিয়া ।
আনন্দ উপমেয় সাগর উপমান , ' ডুবিল ' ক্রিয়াটি সাগরের অনুসারী হয়ে চমৎকার রূপক সৃষ্টি করেছে ।

---

১৫. বাঙলা অলঙ্কার , পৃষ্ঠা, : ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. অনুরাগ্নি সকল সন্তাপ গেল দূরে (শিব -সঙ্কীর্তন, পৃঃ ১৭৪)

অনুর রূপ অগ্নি, উপমেয় অনুর উপমান অগ্নি এ দুইয়ের মধ্যে অভেদ কল্পিত হয়েছে।

৫. দুঃখানলে দেহ জ্বলে দেখি বিপরীত । (ঐ পৃঃ ২৫)

দুঃখ রূপ অনল, এখানে উপমেয় দুঃখ ,উপমান অনল এবং জ্বলে ক্রিয়া উপমান অনুসারী। সুতরাং উদ্ধৃতিটি রূপকালংকারের উদাহরন।

৬. সংসার-সাগর মধ্যে সবে সুখে আছে । (সত্যপীরের কথাঃ পৃঃ ২৯)

৭. কৃপা কর করুনা - সাগর কলানিধি । (ঐ পৃঃ ২৯)

৮. তুমি প্রভু দয়াসিন্ধু মহিমা- সাগর (ঐ পৃঃ ৪৬)

৯. চলিলেন চন্দ্রমুখী চন্দ্রচূড় ছাড়্যা (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৩০)

১০. কামধেনু কুবেরে করিল তিরস্কার । (ঐ পৃঃ ১১৩)

১১. শশিমুখী সকল ইন্দ্রিয় নিল হর্যা (ঐ পৃঃ ১৭৪)

১২. আনন্দসাগরে ভাসে হাসে পদ্মমুখী ॥ (ঐ পৃঃ ১৭৩)

১৩. পুত্র দ্বারা গৃহ সুখে প্রমত্ত হইয়া থাকে, (ঐ পৃঃ ১৯১)
উঠে ডুকে দুঃখের সাগর ॥

১৪. হরিকে কহেন হর শুন কৃপাসিন্ধু (ঐ পৃঃ ১৯২

১৫. খোঁপা বান্ধে চাঁপা আপার সহিত । (ঐ পৃঃ ৩৩৮)
মোহন মল্লিকা মালা মসুক বেষ্টিত ॥

১৬. কামরিপু কামুক কাহিনী কর্যা কোলে (ঐ পৃঃ ৩৪১)

১৭. চান্দমুখে দিয়া মুখ পাসরিল সব দুঃখ
পার্ব্বতীর মাল্য পরিশোষ ।

মধ্যযুগের বিভিন্ন কবির মত, রামেশ্বরও চাঁদ, শশি, সৌদামিনী, কমল ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন রূপক হিসেবে ।

Dhaka University Institutional Repository

খ.৩. উৎপ্রেক্ষা :

"নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় হলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়।" ১৬

উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :-

বদন মরনে যেন রতির বিষাদ হেন
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৪৩)

এখানে উপমেয় মদন মরনে, উপমান রতির বিষাদ বলে কবির যে সংশয় হয়েছে তা 'যেন' শব্দের প্রয়োগেও বোঝা-যাচ্ছে। সুতরাং এটি উৎপ্রেক্ষা অলংকারের দৃষ্টান্ত।

২. পুস্তক পড়িতে দিবে পন্ডিতের ঠাঁই।
গবাগুলা গুম্ব যেন গোবরায় নাই॥ (ঐ পৃঃ ৪৭)

এখানেও উপমেয় 'গবাগুলা উপমান 'গোবরা' বলে কবির যে প্রবল সংশয় হয়েছে তা যেন শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকার সৃষ্টি হয়েছে।

৩. জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা। (শিব সঙ্কীর্ত্তন, পৃঃ ২৩৩)

পংক্তিতে উপমেয় মীন, শিবা এবং উপমান জল এবং শিব, 'যেন' সন্দেহ বাচক শব্দ। উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে যে প্রবল সংশয় ছিল তা 'যেন' শব্দটি দিয়ে বোঝান হয়েছে এবং সম্ভাব্যরূপে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে।

৪. দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শশধর। (ঐ পৃঃ ৪৭)

এখানেও উপমেয় 'কন্যা'র 'সাথে উপমান শশধর বলে যে প্রবল সংশয় হচ্ছে, যা 'যেন' শব্দটি দিয়ে বোঝান হচ্ছে। এখানে কন্যার বেড়ে উঠার সাথে শশধরের বেড়ে উঠার সাদৃশ্য রয়েছে। এজন্য উপমেয়কে উপমান বলে সংশয় দেখা দিচ্ছে। সুতরাং এটি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের জন্ম দিয়েছে।

---

১৬. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃষ্ঠা : ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

উৎপ্রেক্ষার আরো উদাহরণ :

৫. মদন মরনে যেন, রতির বিষাদ হেন,
কান্দে কন্যা করিয়া বিলাপ। (সত্যপীরের কথা, পৃঃ ৪৩)

৬. বুকে বসে বসন্ত কোকিল যেন ডাকে । (ঐ পৃঃ ৪৭)

৭. সর সর কাঁপে দক্ষ রক্ষ রক্ষ কয় ।
গরুড় দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভয় " (শিব সঙ্কীর্ত্তন , পৃঃ ৪৩)

৮. সূর্য্য রশ্মিলেন যেন সৌদামিনী বেড়ি । (ঐ পৃঃ ৪৮)

৯. জীল যেন জননী জীবনদান পাইয়া। (ঐ পৃঃ ৩০)

১০. হুঙ্কারে হাঁকারে ঘন মেঘ যেন গাজে । (ঐ পৃঃ ২৩৭)

১১. ভন ভন করে যেন ভোরঙ্গের নাদ । (ঐ পৃঃ ২৪৯

১২. বনবাস হৈতে রাম যেমন আইন্দ ধাম
ধায় যেন অযোধ্যার লোক ।। (ঐ পৃঃ ২৯৮)

১৩. শিব শিব রটে সদা উঠে পরিতাপ ।
রামের নিমিত্ত যেন সীতার বিপাল ।। (ঐ পৃঃ ২৩৯)

১৪. দরাখানি মূল্য যেন দন্ত দুটী পাটি,
বিদাবে বিংশতি নখে বসুধার মাটি ।। (ঐ পৃঃ ২৮৩)

১৫. পরস্পর প্রেম করা পসারিয়া বাহু ।
শরতের শশী যেন গ্রাস করে রাহু ।। (ঐ পৃঃ ৩৩৫)

১৬. আকুল হয়্যাছে প্রান হয়্যাছে উদবেগ ।
চক্ষু দুটী স্রবে যেন শ্রাবনের মেঘ ।। (ঐ পৃঃ ৮৪)

১৭. চতুষ্পথে চন্দ্রভলা চপল ছাল্যা সাথে
যেন ব্রজবালক বেড়িল ব্রজ নাথে ।। (ঐ পৃঃ ৪৯)

১৮. সোনস্যা সুন্দরী নারী তাকে নাকি সাজে ।
পাদ কুড়া লোক যেন পদ্ম ফুল মাঝে ।। (ঐ পৃঃ ৮৯)

রামেশ্বর ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যে প্রচুর উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন অর্থালংকার প্রয়োগে ক্ষেত্রে উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে কবি বেশ দক্ষতা দেখিয়েছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

খ.৪. বিষম :

"কারণ ও কার্যের বৈষম্য দেখা দিলে কিংবা বিসদৃশ্য বস্তুর একত্র সমাবেশ হলে বিষয় অলংকার হয়।"[১৭]
দৃষ্টান্ত দেয়া হলো -

তুমি না ভাবিলে ধান্ধা কর্মপাশে থাকে ধান্ধা
লোচন থাকিতে সেহ অন্ধ। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ)

এখানে 'লোচন' বা চোখ থাকার পরও সে 'অন্ধ' কারন ও কার্যের গুনের মধ্যে বিরুদ্ধতা বা বৈষম্য থাকায় এখানে বিষম অলঙ্কার হয়েছে।

২. শোভামান সমান সকল কাল বয়।
পাথরে কাছাড় তবু ভাঙ্গিবার নয়॥ (ঐ পৃঃ ৩১০)

৩. তুলায় যায় ভুবন ভাবন হয় ভাল।
উলঙ্গ অঙ্গনা হয় আন্ধারেতে আলো॥ (ঐ পৃঃ ৩১০)

৪. শঙ্খ হাতে থাকিলে সংসারে কারে ভয়।
রোগ শোক-সন্তাপ তিলেক নাহি হয়॥ (ঐ পৃঃ ৩১১)

খ.৫. বিভাবনা :

" যেখানে প্রসিদ্ধ কারন ছাড়াই কার্যের উৎপত্তি হয় সেখানে বিভাবনা অলংকার হয়।"[১৮]

বিভাবনা অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো :-

১. শিঙ্গা শুন্যা শিবলোক সবে আল্য ধায়্যা।
পাসরিল সব দুঃখ চান্দ মুখ চায়্যা॥ (ঐ পৃঃ ২৭৩)

এখানে প্রসিদ্ধ কোন কারন ছাড়াই কার্যের উৎপত্তি হয়েছে। চান্দমুখের দিকে চান্দমুখের দিকে তাকিয়েই তাদের সব দুঃখ প্রসমিত হয়ে গেলো, যারা শিঙ্গার শব্দ শুনে ধেয়ে এসেছিল। সুতরাং সংজ্ঞানুসারে এটি বিভাবনা অলংকার দৃষ্টান্ত।

---

১৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃষ্ঠা - ৮৭
১৮. ঐ পৃষ্ঠা : ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

বিভাবনার কতিপয় দৃষ্টান্ত

১. কথা কও যখন আমার মুখ চায়্যা।
মর‍্যা যেন বাঁচি মৃত সঞ্জীবনী পায়্যা ।। (শিব-সঙ্কীর্তণ, পৃঃ৩১২)

২. ত্রিপুরার তরে ত্রিলোচন করে শোক।
চন্দ্রমুখী বিনা অন্ধকার শিবলোক ।। (ঐ পৃঃ ৩০১)

খ.৬. ব্যতিরেক

"উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ সূচিত হইলে ব্যতিরেক অলংকার হয় ।"২০

ব্যতিরেকের দৃষ্টান্তঃ

১. প্রশস্ত পুড়ি ন্যস্ত করে নেহাই উপর।
উদয় পর্ব্বতে যেন শোভে দিনকর ।। (শিব-সঙ্কীর্তণ, ২২৫)

এখানে 'উদয় পর্ব্বত (উপমান) এর চেয়ে 'দিনকর' (উপমেয়) এর উৎকর্ষ সূচিত হয়েছে বলে ব্যতিরেক অলংকার হয়েছে ।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অর্থালংকারের অনেক সূক্ষ্ম বিভাগ, রয়েছে । অর্থালংকারের প্রকৃতি বিচার করে সেগুলিকে পাঁচভাগে বিন্যস্ত করা হয়। যথা- সাদৃশ্যমূলক অলংকার (উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, অপহ্নতি, নিশ্চয়, ভ্রান্তিমান, উল্লেখ , প্রতিবস্তূপমা, দৃষ্টান্ত , নিদর্শনা, সমাসোক্তি ,ব্যতিরেক, অতিশয়োক্তি এবং প্রতীপ) বিরোধমূলক অলংকার (বিরোধ, বিরোধাভাস, বিষম, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, ও অসঙ্গতি) , শৃঙ্খলামূলক অলংকার (দীপক, তুল্যযোগিতা, সার, একাবলী , কারনমালা ইত্যাদি), ন্যায়মূলক অলংকার (অর্থাপত্তি ,কাব্য-লিঙ্গ, হেতু, অনুমান পরিবৃত্তি বা বিনিময়, পর্যায় , সমুচ্চয়) , গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক অলংকার (অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা ,আক্ষেপ, ব্যাজস্তুতি, স্বভাবোক্তি, সূক্ষ্ম , ভাবিক ইত্যাদি)।

---

২০. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, পৃঃ - ৬২ ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিভাগ ও উপবিভাগ থেকে দেখা যায়, সংস্কৃত অলংকারিকেরা এগুলিকে কত গুরুত্ব দিতেন। যাই হোক, পূর্বোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য শব্দালংকারের প্রায় সবগুলিই দক্ষতার সাথে ব্যবহার করেছেন, অর্থালংকারের মধ্যে বেশী ব্যবহার করেছেন সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকার, বিরোধমূলক অর্থালংকার কিছু করেছেন, বাকি তিনটি বিশেষ ব্যবহার করেননি। পরবর্তী অধ্যায়ে শব্দালংকারের প্রতি কবির ঝোঁকের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

রামেশ্বর ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বরদা পরগনার যদুপুর গ্রামে বাস করতেন । তাঁর জীবনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে । বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষন করে অধ্যাপক সুখময় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি অনুত ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ভনিতায় চারটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেলেও 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' এবং 'সত্যপীরের কথা' কাব্য দু'খানিই তাঁর রচিত গ্রন্থ ।
কবির অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে জানা যায় । কিন্তু জনৈক অত্যাচারী জমিদারের সাথে বিরোধের কারণে সেই বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন । এবং অবশেষে রাজা রামসিংহের আশ্রয় লাভ করে তাঁর সভা-পণ্ডিতের পদ লাভ করেন । রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁরই পুত্র যশোমন্ত সিংহের সভা-পণ্ডিতের আসন লাভ করেন । যশোমন্ত সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহযোগিতায় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'শিব - সঙ্কীর্ত্তন' রচিত হয় । শিব সঙ্কীর্ত্তন' কাব্যের জন্যই কবি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আসন দখল করে আছেন ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য কোন্ ধর্মের অধিকারী ছিলেন তা সঠিক করে বলা যায় না । তাঁর রচিত 'শিব সঙ্কীর্ত্তন' পালা এবং 'সত্য পীরের কথা' উভয় গ্রন্থেই ধর্ম সমন্বয়ের সু-উচ্চ আদর্শ রক্ষিত হয়েছে ।

দুই

কবি সমকালে বাংলার যে আর্থিক চিত্র পাওয়া যায় তাতে এদেশকে দরিদ্র বলা যায় না । কিন্তু ভেতরে ভেতরে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল । রাজনৈতিক ভাবে কিছুটা স্থিতিশীলতা ছিল । দেশের প্রশাসনিক অবস্থা দুর্বল হওয়ায় বিদেশে বণিকদের একক বাণিজ্য মগ-হার্মাদদের লুট-পাট, সুবাদারদের দায়িত্বহীন ভাব ও বাংলা থেকে সম্পদ পাচার সব মিলিয়ে বাঙালীকে একেবারে কাঙাল বানিয়ে ছেড়েছিল । সমাজে বড় ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং যার ফলে ধনীরা আরো ধনী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্র হয়ে পরেছিল, সম্পদের অসম বন্টনে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

রামেশ্বর ভট্টাচার্য আঠার শতকের কবি, আর আঠার শতককেই বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়েছিল। ইংরেজরা এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভের কিছুদিনের মধ্যে যখন আমাদের জীবনমূল ধরেই টান দিল তখন ঘূর্ণিবাত্যা তাড়িত ধূলিকণার মত ক্ষণকাল এদেশের মানুষ অনিশ্চয়তায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। রামেশ্বর ভট্টাচার্য এই সময়ের কবি বলেই সেই যুগের যুগ-প্রভাব তাঁর রচনায় এসেছে অনিবার্যভাবে। তাঁর 'শিব সঙ্কীর্তন' কাব্যটিতে জীবন্তভাবে সে সময়ের সামাজিক জীবন ও পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে।

তিন

মধ্যযুগের সব গুরুত্বপূর্ণ কাব্যে বিষয় উপস্থাপনার পাশাপাশি আঙ্গিক প্রসাধনে যত্ন দেয়া হয়েছে। কবিরা সর্বপ্রকার অলংকার ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিভা এবং বিষয়ের অনুরোধে অলংকার ব্যবহারে তারতম্য থাকলেও সচেতনভাবে তাঁরা কবিতার বহিঃরঙ্গকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগের দীর্ঘ সময়ে বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে সে যুগের প্রধান সাহিত্য কর্মগুলো হলো বৈষ্ণব পদাবলী, রোমান্স কাব্য, মঙ্গলকাব্য, ইত্যাদি। পদকর্তারা তাঁদের পদগুলিতে অলংকার ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথে। নানা রকম অলংকার প্রয়োগের ফলে বৈষ্ণব পদ সাহিত্য কাব্যরসিকদের কাছে খুব উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দুই প্রকার অলংকারেরই প্রয়োগ দেখা যায়। চণ্ডীদাস এবং তাঁর ভাবশিষ্য জ্ঞানদাস অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ-সরল রীতি অনুসরন করেছেন এবং তাঁরা পল্লী জীবন থেকেই অলংকারের উপাদান খুঁজেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস সংস্কৃত অলংকরণ রীতিই গ্রহন করেছেন।

রোমান্স কাব্যে অলংকারের মধ্যে শব্দালংকারের চেয়ে অর্থালংকারের প্রয়োগ বেশি দেখা যায়। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস রোমান্স কাহিনীকারদের প্রিয় বিষয় ছিল।

মঙ্গলকাব্যের কবিরাও প্রচুর অলংকার ব্যবহার করেছেন। তাঁদের প্রায় সবার রচনাতেই শব্দালংকারের প্রাধান্য। অনুপ্রাস ছিল তাঁদের প্রিয় অলংকার।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতচন্দ্রের কাব্যের ভাষাই আলংকারিক। অর্থালংকার ব্যবহারে কবির একটি বিশেষ প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিরোধমূলক অলংকারের প্রতি তাঁর খুবই আসক্তি ছিল। কবিকঙ্কন মুকন্দরামের কবিতায় গ্রামীন অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দুই উৎস থেকেই অলংকার চয়ন করেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের ভাষা অত্যন্ত মার্জিত এবং রুচি সম্মত। যথাযথ অনুপ্রাস প্রয়োগ তাঁর রচনাকে অনেক সময় শ্রুতিমধুর করেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে শব্দালংকার এবং অর্থালংকার উভয় জাতীয় অলংকারের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে অর্থালংকার ব্যবহারের দিকে তাঁর প্রবণতা বেশী। শব্দালংকারের মধ্যে অনুপ্রাস এবং যমকের প্রয়োগ লক্ষ্য করবার মতো। রামেশ্বর ভট্টাচার্য মঙ্গলকাব্যধারারই কবি।

চার

রামেশ্বর ভট্টাচার্য কিছু কিছু শব্দের প্রতি বিশেষ দুর্বল ছিলেন বলে, সেই সব শব্দ বার বার ব্যবহার করতেন। এটি তাঁর রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন চন্দ্রচূড়চরণ, দক্ষ, যজ্ঞ, সতী, ভুজঙ্গ, শশধর, শশি, নিশি, পুন্য, জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি শব্দ কবি তাঁর কাব্যে বহুবার ব্যবহার করেছেন।

তিনি তৎসম ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার করেছেন। দুরূহ শব্দ ব্যবহারে তাঁর রচনা কখনো কখনো দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষা সমসাময়িক কবিদের ভাষা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। ভাষার সম্ভাবনা আবিষ্কারের জন্য রামেশ্বর নতুন ও বিচিত্র শব্দ ব্যবহার করেছেন। লোকঐতিহ্য এবং ফারসী সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহেও কবি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্রে এবং বিভিন্ন ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত তো জানতেনই, সেই সাথে ফার্সী ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা ছিল তাঁর। মুসলিম ঐতিহ্যের সাথে কবির সম্যক পরিচয় ছিল। তাই তাঁর কাব্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুসলিম ঐতিহ্যগত উল্লেখ এসেছে। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ঐতিহ্যের অনুসরনের মধ্যে আমরা কবির উদার এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির পরিচয় পাই। কবির এই ধর্ম-সমন্বয় প্রচেষ্টা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য।

সংস্কৃত ভাষায় কবির পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে শব্দ চয়নে ও কাব্যশৈলী নির্মানে। পাণ্ডিত্য এবং বৈদগ্ধ্য তাঁর কাব্যে এক প্রকার সুরুচির জন্ম দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কবি তাঁর কাব্যের বহু পংক্তিতে বিভিন্ন পৌরাণিক নাম ব্যবহার করেছেন । কখনো তা ব্যবহার করেছেন সাধারন বর্ণনার জন্য, আবার কখনো বা উপমাও রূপক হিসেবে ।

যেমন -

থর থর কাঁপে দক্ষ রক্ষ রক্ষ কয় । (শিব সঙ্কীর্তন, পৃষ্ঠা ৪৩)
গরুড় দেখিয়া যেন ভুজঙ্গের ভয় ।।

তাছাড়া তাঁর কাব্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে নানা রকম পৌরাণিক নাম । যেমন - অনিরুদ্ধ, অশ্বমেধ, যজ্ঞ, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, গরুড়, ভীম, সুরস্বতী, রথ, রম্ভা, রাধা, নারদ ইত্যাদি। এ ছাড়া কবি অনেক প্রবাদ ও প্রবচনও ব্যবহার করেছেন । তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা মূর্ত হয়েছে কখনও উপমা রূপকে এবং কখনো বা প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির ব্যবহারে ।

সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব কবিই প্রবচনের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন । রামেশ্বরও তাঁর কাব্যে প্রচুর প্রবচন ব্যবহার করেছেন । যেমন -

১. জানিল অনর্থ মাত্র অর্থ হৈতে হয় ।। (শিব সঙ্কীর্তণ, পৃষ্ঠা ১১৬)
২. অধমের ধন হইলে ধর্ম্ম পথ ছাড়ে ।। (ঐ পৃষ্ঠা ১১৬)
৩. সতত সতের হিংসা অসতের ধর্ম্ম ।। (ঐ পৃঃ ১৩২)
৪. পুত্রিজ আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল ।। (ঐ পৃঃ ১৫)
৫. দিনে হও ব্রহ্মচারী রাতে গলাকাটা ।। (ঐ পৃঃ ১১৪)

ইত্যাদি এ রকম আরো অনেক বুদ্ধিদীপ্ত প্রবচন রামেশ্বরের কাব্যের যএ-তএ পাওয়া যায় ।।

পাঁচ

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রবনতা শব্দালংকারের প্রতি, কারণ শব্দলংকার ব্যবহার করে কাব্যের বহিঃরঙ্গকে ঝক ঝকে করা যায় । তাঁর কাব্যের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রায় সব ধরনের শব্দালংকারের সমাবেশ রয়েছে । তিনি একই পংক্তিতে বিবিধ অলংকার প্রয়োগ করার কৌশল জানতেন । এটা তাঁর স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল ।

যেমন - বৃষ্টি কৈল বসু যেন বলাহকে বার
কামধেনু কুবেরে করিল তিরস্কার ।।

এখানে দেখা যাচ্ছে একই পংক্তিতে একই সাথে তিনি অনুপ্রাস, অন্ত্যানুপ্রাস, শ্রুত্যানুপ্রাস, অন্ত্যমক, রূপক এবং উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন । এ রকম বহু পংক্তি রয়েছে যাতে একাধিক

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্কার একই সাথে ব্যবহৃত হয়েছে ।

শব্দালংকারের মধ্যে তাঁর কবিতায় অনুপ্রাসের প্রাধান্য । তাঁর কবিতার চরণে-চরণে অনুপ্রাসের ব্যবহার উজ্জ্বল এবং অবিরল ।

যেমন - ১. আকুল হয়্যাছে প্রাণ হয়্যাছে উদবেগ । (শিব সঙ্কীর্ত্তন, পৃঃ ৮৪)
চক্ষু দুটি স্রবে যেন শ্রাবণের মেঘ ।।

২. সুমন্দিরে সুন্দরী সুন্দর বর দেখি,
আনন্দ সাগরে ভাসে হাসে পদ্মমুখী।।

তিনি একই সাথে অন্ত্যানুপ্রাস, ছেকানুপ্রাস, বৃত্ত্যানুপ্রাস এবং শ্রুত্যনুপ্রাস সৃষ্টিতে পারদর্শী ছিলেন । অনুপ্রাসের ব্যবহার সব সময় শ্রুতিসুখকর হয়নি ।

যেমন - ১. কাত্যায়নী কৌতুক কানের কথা শুন্যা (শিব সঙ্কীর্ত্তণ , পৃঃ ১১৩)
ঝাম্পিয়া ঝটিতি ঝুলি বাড়িলেন আন্যা ।।

২. হায় হায় হায় হেদে হাভাত্যার ঝি । (ঐ পৃঃ ৮৭)
নিরঞ্জন নিন্দা ভাল নির্ব্বাচিব কি ।।

৩. চন্দ্রপানি চরিতার্থ চন্দ্রিকের বোলে । (ঐ পৃঃ ১৪৫)
চারিভুজ চাপিয়া চন্দ্রিকে কৈল কোলে ।।

শিব সঙ্কীর্ত্তনে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, পুনরুক্তবদাভাষ ইত্যাদি প্রয়োগ রয়েছে । বক্রোক্তির ব্যবহার তিনি বিশেষ করেননি । যমকের মধ্যে আদ্য, মধ্য এবং অন্ত যমক এ তিনটি তিনি প্রয়োগ করেছেন সার্থকভাবে । তাঁর নির্মিত শ্লেষগুলোও চমৎকার । সাধারণভাবে বলা যায় শব্দালংকারের প্রায় সব কয়টি শাখাই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি প্রয়োগ করেছেন । শব্দালংকারের প্রতি ঝোঁক থাকলেও কবি অর্থালংকারও ব্যবহার করেছেন, যদিও এতে কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি । তাঁর উপমা রূপকগুলোর মধ্যে নতুনত্ব নেই। উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে তিনি কিছুটা দক্ষতা দেখিয়েছেন । উপমা এবং রূপকের চেয়ে উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার বিচিত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

সাদৃশ্যমূলক অলংকারের মধ্যে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ব্যতিরেক ইত্যাদির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য; বিরোধমূলক অলংকারের মধ্যে বিভাবনা এবং বিষম ব্যবহার করেছেন। অর্থালংকার শাখার শৃঙ্খলামূলক, ন্যায়মূলক এবং গূঢ়ার্থমূলক অলংকারের প্রয়োগ বিশেষ দেখা যায় না।

মধ্যযুগের সাহিত্যে কবিদের কৃতিত্ব প্রকাশের প্রিয় ক্ষেত্র ছিল রূপ বর্ণনায়। রূপ বর্ণনা অংশে একদিকে যেমন কবিরা আলঙ্কারিক কলা-কৌশল প্রকাশের সুযোগ পান, অন্যদিকে তেমনি তাঁদের হৃদয়ের সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়। রামেশ্বরও এই সুযোগটি হাতছাড়া করেননি। তিনি বাগদিনীর এবং অনিরুদ্ধ-এর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ঐতিহ্যকে অনুসরন করেছেন। সে সব বস্তুর সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকৃতিগত সাদৃশ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান হয়েছে। সে কারণে কবির রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেও খুব প্রানবন্ত হয়ে উঠেনি। তাঁর কাব্যে সাদৃশ্যমূলক অর্থালংকারের প্রয়োগ সে কারণে বেশী। কবি পারিপার্শ্বিক জগৎ, জীবন এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। রামায়ন মহাভারত পুরাণাদি ইত্যাদি শাস্ত্র কবির নখদর্পনে ছিল। পুরানাদি শাস্ত্রে যে তাঁর ব্যাপক অধিকার ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় কাব্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্রের উল্লেখে।

যেমন -

১. সোনস্যা সুন্দরী নারী তাকে নাকি সাজে। (শিব সঙ্কীর্তন, পৃঃ ৮১)
পাদকুড়া পোক যেন পদ্মফুল মাঝে।

২. সুন্দর দেখিয়া শঙ্খ সুন্দরী সকল। (ঐ পৃঃ ৩০৭)
গোবিন্দের তরে যেন গোবিনী কিকল।।

পংক্তিগুলোতে দেখা যাচ্ছে এখানে উপমাগুলো এসেছে একাধারে চারপাশের জগৎ, জীবন এবং বাস্তব অনুভূতি ও পৌরাণিক নাম গুলো থেকে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের সমগ্র কাব্য গ্রন্থের সার্বিক আলঙ্কারিক আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্য-গুলো চোখে পরে -

Dhaka University Institutional Repository

তা হলো -

১. শব্দালংকারের প্রতি ঝোঁক ;

২. শব্দালংকারের সব কয়টি শাখাই তিনি ব্যবহার করেছেন । তবে অনুপ্রাস ব্যবহার অধিক । এটা অনেক সময় স্বাভাবিক না হয়ে কখনো কখনো কষ্টদায়ক হয়েছে ।

৩. শব্দালংকারের প্রতি ঝোঁক থাকলেও অর্থালংকারও ব্যবহার করেছেন । অর্থালংকারের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক এবং বিরোধমূলক অলংকারের প্রয়োগ রয়েছে । অর্থালংকারের অন্যান্য শাখা তিনি বিশেষ ব্যবহার করেননি ; ব্যবহার করলেও সেখানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি ।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের অলংকার ব্যবহারে এই প্রবণতা নিম্নভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

প্রথমত : তিনি আঠার শতকের কবি; আঠার শতককে বাংলা সাহিত্যের অবক্ষয়ের কাল ধরা হয় । 'শিব সঙ্কীর্তন' অবক্ষয় কালের ফসল । তাঁর কাব্যে অবক্ষয় কালের প্রভাব রয়েছে । অন্তরের উৎস যখন শুকিয়ে যায়, মানুষ তখন বাইরের দিকে আকৃষ্ট হয় । অবক্ষয় কালের সাহিত্যের কবিদের বহিঃরঙ্গ ভূষণের দিকে নজর ছিল বেশী । তাঁরা শব্দালংকার ব্যবহার করে শব্দের ঝংকার সৃষ্টি করে তাদের শূন্যতা পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন । রামেশ্বর ভট্টাচার্য এ যুগের কবি হওয়ায় হয়তো তিনিও কালের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ।

দ্বিতীয়ত : মধ্যযুগের প্রায় সারা সময় ধরেই দেখা গেছে শব্দালংকারের প্রতি কবিদের ঝোঁক ছিল বেশী । রোমান্স কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, কিংবা মঙ্গল কাব্য এ সব ধরনের কাব্যের মধ্যে শব্দালংকারই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে । শব্দালংকারের মধ্যে অনেকেই অনুপ্রাসে আসক্ত ছিলেন । রামেশ্বর ভট্টাচার্য সেই ঐতিহ্য প্রভাবিত হয়ে শব্দালংকার, বিশেষ করে অনুপ্রাসের ব্যবহারে আগ্রহ বোধ করেছেন ।

তৃতীয়তঃ 'শিব-সঙ্কীর্তন' কাব্য চাষী গৃহস্থের জীবনকাহিনী ভিত্তিক । শিবায়নের পাঠক সমাজও প্রধানত কৃষক ছিল বলে মনে হয় । কৃষক সমাজ ছিল অল্প শিক্ষিত এবং নিরক্ষর । তাঁরা শব্দের ঝংকারে বেশী আকৃষ্ট হতো । শব্দের অর্থ তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না ।

Dhaka University Institutional Repository

রামেশ্বর হয়তো তাঁর কাব্যের পাঠক সমাজের কথা চিন্তা করেই শব্দালংকার ব্যবহার করে থাকতে পারেন ।

চতুর্থত : শিব-সঙ্কীর্তনের শিব দেবতা হলেও দেবসুলভ আধ্যাত্মিকতা, অতীন্দ্রিয়তা বা অলৌকিকতা প্রভৃতির পরিবর্তে দেবতার লৌকিক জীবনই কাব্যে অবলম্বিত হয়েছে । শিবের বহিরঙ্গ জীবন প্রাধান্য পাওয়ায় কাব্যেও কবিতার বহিরঙ্গ দিকটি প্রধান হয়ে উঠেছে । তেমন ধারনা অসংগত নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থ পঞ্জী

আলোচিত গ্রন্থসমূহ :-

ক. রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্য:-

১. 'শিব সঙ্কীর্তন', শ্রীযোগিলাল হালদার কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৫৭)।

২. 'সত্যপীরের কথা', শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৩৩৬)।

খ. মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্য :-

১. আলাওল, পদ্মাবতী, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৩৫৬)।

২. কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, চন্ডীমঙ্গল, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৩৬)।

৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, 'মনসামঙ্গল', শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, (কলকাতা : ১৯৪৩)।

৪. ঘনরাম চক্রবর্তী, শ্রীধর্মমঙ্গল, শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৬২)।

৫. জায়সী ও আলাওল, পদ্মাবতী, দেবনাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৮৫)।

৬. দোনাগাজী, সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী : ১৯৫৭)।

৭. দৌলত কাজী, সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী, ময়হারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৯৭৩), দ্বিতীয় সংস্করণ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. দৌলত উজীর বাহরাম খান, লায়লী-মজনু, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা, বাংলা একাডেমী : ১৯৫৭)।

৯. ভারতচন্দ্র রায়, ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত, প্রথম খন্ড, (কলকাতা : ১৩৪৯)।

১০. ভারতচন্দ্র রায়, ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত, ২য় খন্ড, (কলকাতা : ১৩৫০)।

১১. মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা, মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও ডক্টর আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা : ১৩৭৫)।

১২. মুহাম্মদ কবির, মধুমালতী, আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী : ১৩৩৬)।

গ. অলংকার সম্পর্কিত গ্রন্থাদি :

১. অতীন্দ্র মজুমদার, বাংলা কবিতার ছন্দ ও অলংকার, (কলকাতা : ১৯৮৫)।

২. আনন্দবর্দ্ধন, ধ্বন্যালোক, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালিপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত, (কলকাতা : ১৯৭২)।

৩. জীবেন্দ্র সিংহ রায়, বাঙলা অলংকার,, (কলকাতা : ১৯৮৫), ৬ষ্ঠ সংস্করণ।

৪. নরেন বিশ্বাস, অলঙ্কার অন্বেষা, (ঢাকা : ১৯৭৬)।

Dhaka University Institutional Repository

৫. শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ছন্দ মীমাংসা ও অলংকার সমীক্ষা,
(কলকাতা : ১৯৮৪) ।

৬. সাহিত্য দর্পণ, শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং সম্পাদিত,
(কলকাতা : ১৩৮৬), দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৭. ডঃ সুধীর-কুমার দাস গুপ্ত, কাব্যালোক, (কলকাতা: ১৩৭৯), চতুর্থ সংস্করণ ।

৮. ডঃ সুধীর কুমার দাস গুপ্ত, কাব্য-শ্রী, (কলকাতা : ১৩৭১) দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৯. শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলংকার চন্দ্রিকা, (কলকাতা: ১৩৬৩), দ্বিতীয় সংস্করণ ।

ঘ. সাহিত্যের ইতিহাস ও অন্যান্য :

১. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, (কলকাতা : ১৯৯০),
দশম পরিবর্তিত সংস্করণ ।

২. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, (কলকাতা : ১৯৮৯),
সপ্তম সংস্করণ ।

৩. ডঃ আহমদ শরীফ, ইতিহাসের ধারায় বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব,
(কলকাতা : ১৯৯২) ।

৪. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালীও বাঙলা সাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা : ১৯৮৩) ।

Dhaka University Institutional Repository

৫. আহমদ কবির, রবীন্দ্র কাব্যে উপমা ও প্রতীক, (ঢাকা : ১৯৮৬) ।

৬. আব্দুল হাফিজ, বাংলা রোমান্স কাব্য পরিচয়, (ঢাকা : ১৯৬৪) ।

৭. আমিনুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা : ১৯৬৪) ।

৮. ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা : ১৯৯০) ।

৯. গোলাম সাকলায়েন, ফকীর গরীবুল্লাহ, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী : ১৯৬২) ।

১০. শ্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য, বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পাশ্চাৎপট ও উৎস, (কলকাতা : ১৯৭৪) ।

১১. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, (কলকাতা : ১৯৯১/বি) ।

১২. ভোলানাথ ঘোষ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতা : ১৩৮৮) ।

১৩. মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত, কবি হেয়াত মামুদ, (রাজশাহী : ১৯৬১) ।

১৪. মুরারি ঘোষ, প্রাক আধুনিক বঙ্গ সংস্কৃতি (কলকাতা : ১৯৮৬) ।

১৫. রফিকুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত নজরুল সমীক্ষা, নজরুল বক্তৃতামালা, ১৯৯২ সংকলন (ঢাকা) ।

১৬. রাজিয়া সুলতানা, আব্দুল হাকিম; কবি ও কাব্য, (ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৮৭) ।

Dhaka University Institutional Repository

১৭. শঙ্করী প্রসাদ বসু, কবি ভারতচন্দ্র, (কলকাতা : ১৩৮১) ।

১৮. শ্রী শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদ, (কলকাতা : ১৯৬৭) ।

১৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, (কলকাতা : ১৯৮৮) ।

২০. শ্রীসুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, (কলকাতা : ১৯৪০)।

২১. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্ পলাশী বাংলা, (কলকাতা : ১৯৮২) ।

২২. সিদ্দিকা মাহমুদা, সুধীন্দ্রনাথ; কবি ও কাব্য, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী : ১৯৯২) ।

২৩. ক্ষেত্রগুপ্ত, কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, (কলকাতা: ১৯৮৯) দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৬. বাংলা অভিধান :

১. আশুতোষ দেব, নূতন বাঙ্গালা অভিধান (কলকাতা : ১৯৭৬) , তৃতীয় সংস্করণ ।

২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, (কলকাতা : ১৯৭১) ।

৩. শ্রী জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস, বাংলা ভাষার অভিধান, দুই খন্ড, (কলকাতা : ১৯৭৯), দ্বিতীয় সংস্করণ ।

৪. শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, (কলকাতা: ১৯৭৬) ।

৫. রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, (কলকাতা: ১৩৮৫), দ্বাদশ সংস্করণ ।

৬. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, (কলকাতা: ১৯৮৯), ৬ষ্ঠ সংস্করণ ।